৪২নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ডি. এম. লাইব্রেরী হইতে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও ৮৩।বি, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা, বাণী-শ্রী প্রেস, শ্রীসুকুমার চৌধুরী দ্বারা মুদ্রিত।

শিল্পি-বন্ধু শ্রীঅনিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়েছেন। বন্ধুবর শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস, শ্রীভবতোষ দত্ত, শ্রীসুনীলকান্তি সেন ও পরম স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান নওলকিশোর কেজরিওয়াল ছাপানোর কাজে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। ডি. এম. লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপালদাস মজুমদার বইখানিকে সুন্দর ক'রে তুলতে যথেষ্ট প্রয়াস পেয়েছেন। এঁদের সকলকে আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই অগ্রজপ্রতিম শ্রীপবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়-কে। তাঁর ঋণ অপরিশোধনীয়।

আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে
১৩৫৮
হাওড়া।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শেঠ।

অগ্রজ শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ শেঠের
করকমলে

—•—

শেষদান

জাহ্নবীর শান্তধারা দূর-অভিসারে
নিঃশব্দে বহিয়া চলে, রাত্রির আঁধারে
কাঁপে কৃষ্ণা সপ্তমীর তিথি, জনহীন
সুদীর্ঘ বালুকাতট বিষাদবিলীন,
অনিমেষ চেয়ে আছে আর্ত বিরহীর
ব্যথাহত প্রতীক্ষার মত, বনানীর
তরুশ্রেণী তপোমগ্ন প্রশান্ত উদাস
তন্দ্রাতুর অন্ধকারে ফেলিছে নিশ্বাস,
যেন শত ছায়ামূর্তি নিশা-সহচর।
ক্লান্তগতি বহি চলে নিঃসঙ্গ প্রহর।
বন হ'তে বাহিরিল অতি ধীরে ধীরে
বিষণ্ণ শান্তনু, দাঁড়াল জাহ্নবীতীরে
ব্যথাম্লান আঁখি তুলি আকাশের পানে—
সপ্তর্ষি দিয়েছে পাড়ি রাত্রি-অভিযানে,
জ্যোতির্ময় ছায়াপথ আলোক বিকাশি
নেমেছে পর্বত-ভালে, পৃথিবী-নিবাসী
যেন কোন নব গঙ্গাধর ধরি শিরে
আলোক-জাহ্নবীধারা দাঁড়ায়েছে ধীরে
সমুন্নত ভালে।
তপোমগ্ন ত্রিযামার
যোগনিদ্রা ভাঙি অকস্মাৎ বেদনার

হাহাকার ছুটে গেল দিকে দিগন্তরে
বাণবিদ্ধ-কুরঙ্গিণী-সম, আর্তস্বরে
শান্তনু উঠিল কাঁদি, স্থির নদীনীরে
পড়িল চঞ্চলছায়া, দাঁড়াল সে ফিরে
সান্ত্বনার আতুর তৃষায়, রজনীর
অন্ধকারে ক্লান্ততনু আকুল অধীর।
জাহ্নবী চলিয়া গেছে রাজগৃহ ছাড়ি
অনুক্ষণ শোকতপ্ত বেদনা তাহারি
ফিরিছে কাঁদিয়া শান্তনুর মর্মমূলে,
বিরহবিধুর তাই জাহ্নবীর কূলে
নিত্য অভিসার তার—প্রেয়সীর লাগি'
ভ্রমিছে নৃপতি নিত্য প্রবাসী বিরাগী।

রজনী গভীর হ'ল—অন্ধকার ধীরে
গাঢ় হ'য়ে আসে, জনশূন্য নদীনীরে
এখনও কাঁপিছে তার দীর্ঘায়ত ছায়া,
বক্ষে আজো মিলনের স্বপ্নভরা মায়া—
তাই সে প্রসারি বাহু সমুন্নত শিরে
উচ্চারিল প্রেমঋক্ ধীরে অতি ধীরে,
প্রেয়সীরে চাহি—অয়ি স্বপ্ন-স্বরূপিণী
অয়ি মোর প্রিয়া, অয়ি মানস-মোহিনী,
আসিবেনা আরবার ? মুগ্ধ আঁখি ভরি
অপরূপ রূপরাশি পড়িবেনা ঝরি ?
মনে পড়ে আজও প্রাসাদ-অলিন্দ-'পরে
চন্দ্রমা-মাধুরী ধারা যবে স্তরে স্তরে

পড়িত ঝরিয়া, শাপভ্রষ্টা উর্বশীর
মত ঘুমায়ে পড়িতে যবে, রজনীর
ধ্যানচ্ছবি বিকশিত শান্ত সুপ্ত মুখে,
দাঁড়াইয়া পার্শ্বে তব দুরু-দুরু বুকে
কাঁপিত পরাণ, নিদ্রিত পল্লব-'পরে
দুলিত রহস্য, অসহ্য আবেগ-ভরে
উতলা-হৃদয়, বক্ষে লইতাম টানি
দেবতাবাঞ্ছিত তব সুধাস্পর্শ খানি।
বিচিত্র রাগিণী, বিরহ-মিলন-কথা
মানবের অভিনব প্রেমের বারতা
করুণ কোমল সুরে গেয়ে যেত কারা !
অকস্মাৎ বর্তমান আদি-অন্ত-হারা
মুহূর্তের মাঝে ; শতকোটি গ্রহতারা
উঠিত শিহরি', অন্তরীক্ষে দেবতারা
অমিয় আশিষরাশি করিত বর্ষণ
মোদের দোঁহার-'পরে। সে কি স্বপ্নকথা ?
জীবনের চিত্রপটে তাহার বারতা।
মুছে যাবে চিরতরে! কোন চিহ্ন তার
রবে নাকো কোনখানে ? শূন্য অন্ধকার
বিরাজিবে শুধু ?

গভীর উদাত্ত স্বর

শান্ত তাল-লয়ে শিহরিয়া থর থর
ভেসে গেল দিগ্বলয় চুমি। নিশীথের
নিদ্রিত বাসরে শ্যামশীর্ষ অরণ্যের
পল্লবমাঝারে যেই ধ্বনি উঠে জেগে

কোণার্ক

স্পন্দমান বাতাসের হিল্লোল-আবেগে
ক্ষণপরে ডুবে যায় নৈঃশব্দ্য-সাগরে
তারি মত সচকিয়া স্তব্ধ দিগন্তরে
ডুবে গেল সে স্বর-লহরী। যামিনীর
ধীরে ধীরে হ'ল রূপান্তর—সপ্তমীর
শুভ্রশশী আকাশের 'পর দিল আঁকি
লাবণ্যের চুম্বন-বিথার! মুগ্ধ-আঁখি
জ্যোৎস্নাময়ী দেবনারী স্খলিত অঞ্চলে
ত্রস্তপদে এলো নামি সুপ্ত ধরাতলে।
বালুতটে, নদীনীরে অরণ্য-শিয়রে
রাখি স্নেহস্পর্শখানি বিশ্বচরাচরে
মেলি দিল অপরূপ স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার,
চরণে মরিয়া গেল মুগ্ধ অন্ধকার
দুঃসহ পুলকে।

স্থির তটিনীর জল
অপূর্ব পুলকভরে আবেগ-চঞ্চল
উঠিল উচ্ছ্বসি। সহসা জাগিল কার
শুভ্রমূর্তি অতুলন, সৌন্দর্য অপার
নীল নদী-নীরে। অপূর্ব-শোভনা নারী
পদে পদে অপরূপ লাবণ্য বিথারি
স্থিরনেত্রে দাঁড়াইল জাহ্নবীর কূলে,
পূর্বাশার হৈমদ্বার গেল বুঝি খুলে
নিশান্ত তিমির টুটি। অনন্ত সুন্দর
অকলুষা মূর্তি হেরি স্তব্ধ নীলাম্বর
রহিল চাহিয়া; কমল-চরণ চুমি

বারে বারে শিহরিল মুগ্ধা মর্তভূমি
পরশ-রভসে। নৃপতি রহিল চাহি
বিস্ময়-ব্যাকুল, মুখে তার বাক্য নাহি
সরে। নয়ন ভরিয়া উপজিল মায়া
সত্য বুঝি স্বপ্ন হ'ল—মনে হ'ল ছায়া
আকাশ ধরণীতল নদী গিরি বন
আনন্দ বেদনা দুঃখ জীবন মরণ
স্বপনের মাঝে হ'য়ে গেল একাকার।
অভিনব অবসান বিরহ ব্যথার।

জাহ্নবী কহিল তারে মধুর বচনে,
"আমারে পাবেনা তুমি পরশবন্ধনে।
আমি স্বর্গবাসী, নহি মর্ত্ত্য মানবের,
দেবকার্য সাধিবার তরে তোমাদের
গৃহে এসেছিনু নামি'। স্বকার্য সাধিয়া'
পুনঃ পুণ্য স্বর্গধামে এসেছি চলিয়া
চির জীবনের তরে। তবু নরবর,
ভুলিবনা কোনদিন অনিত্য সুন্দর
এই মর্ত-মানবের ঐশ্বর্য অপার,
ভুলিবনা কোনদিন এই বসুধার
শ্যামস্নিগ্ধ শষ্পতট, চিরপ্রিয় গেহ
সুগভীর ভালবাসা, সুধাভরা স্নেহ
জীবনের সুখস্পর্শসম। নরবর,
আর নাহি ভুলিব তোমারে, নিরন্তর

জেগে রবে স্মৃতি তব শুভ্র অনুপম
মুদিত পদ্মের বক্ষে মুগ্ধ গন্ধসম
মধুর অম্লান। তুমি ভুলিও আমারে,
যাহা ধরিবার নহে তাহা ধরিবারে
কোরোনা কামনা। জীবনের শ্রেষ্ঠধন
দেবব্রত পুত্ররত্ন করিনু অর্পণ
আজি তব করে, তুমি ভুলিও আমারে।"

নীরব হইল দেবী, স্তব্ধতা-পাথারে
ডুবে গেল কণ্ঠস্বর। কান্ত পদতলে
চন্দ্রমার গলিত মাধুরী নদীজলে
উচ্ছ্বসি পড়িল ভাঙি, স্বর্গের বিভূতি
ধরণীর গৃহপ্রান্তে অমৃত-আকৃতি
রাখি চলি গেল ধীরে। কেহ নাহি আর,
শীর্ণ শশী অস্তগেল। নিশান্ত আঁধার
টুটিল নীরবে। উদয়-দিগন্ত ভরি
অরুণ-কিরণ-কম্প উঠিল শিহরি—
বর্ণের আলিম্প আঁকি আকাশের পটে।
তন্দ্রামুক্ত নরপতি। জাহ্নবীর তটে
নামিল প্রভাত আলো। ধীরে অতি ধীরে
বালুতীর অতিক্রমি শ্রদ্ধানত শিরে
আসিল তরুণমূর্তি। শুভ্র তনুখানি
স্নিগ্ধদীপ্তি ভরা, প্রাতঃসূর্য দিল আনি
আলোক-ঐশ্বর্য তার সর্বাঙ্গ চুমিয়া—

নৃপতি বিস্ময়স্তব্ধ রহিল চাহিয়া
প্রিয় পুত্র-পানে।
তখন আকাশ জুড়ে
জাগিছে বন্দনাগান অভিনব সুরে।

১৩৪১

অপর্ণা

মদন হয়েছে ভস্ম, কান্তারে গহনে
অশ্রু-আঁখি স্মরবধূ অশ্রান্ত চরণে
ফিরে অহরহ। সমগ্র আকাশ ভরি
বেদনা-ক্রন্দন তার ফিরিছে গুমরি।
স্খলিত কুসুমদামে কাঁদে বনতল,
সন্ত্রস্ত অনঙ্গ-সখা দুঃস্বপ্ন-বিহ্বল
কুসুম-বিকীর্ণ পথে কোথায় সুদূরে
কাঁদিয়া চলিয়া গেছে ব্যথাহত সুরে
বাণবিদ্ধ-মৃগসম। বনলক্ষ্মীগণ
পূজার্থিনী বসে আছে বিষণ্ণ-নয়ন
ধ্যানরতা পার্বতীরে ঘেরি, দ্বিপ্রহর
রৌদ্রের দগ্ধতাভারে বিমর্ষ মন্থর-
গতি, চলে কি না চলে।
দূর শৈলান্তরে
তপোভঙ্গে বিরূপাক্ষ মহাক্রোধভরে
গিয়াছে চলিয়া ; পার্বতী করেছে পণ
ফিরায়ে আনিবে তারে প্রসন্ন-আনন

নিভৃত ধ্যানের পথে। বিষাদ-মলিন
শৈলসুতা তাই শিলাতলে সমাসীন
মহেশের ধ্যানে। বৈরাগ্য-অনল জ্বালি
সাধিছেন অগ্নিহোত্র দিতেছেন ডালি
কামনা বাসনা ক্ষুদ্র। তনু তপঃক্ষীণ
পরিহিত-রক্তাম্বর, পদ্মাসনাসীন,
বিলম্বিত স্রস্ত কেশভার পরিকীর্ণ
অংসদেশে জটিল জটায়, ভ্রষ্ট জীর্ণ
ব্রততী-বলয়। জ্যোতির্ময়ী ধ্যান-লীনা,
সবিতার রক্তদ্যুতি যেন স্তব্ধাসীনা
দেহের বন্ধনে।

চৌদিকে পাদপস্থলী
পত্রবন্ধে পার্বতীরে রেখেছে আগলি।
সুবিন্যস্ত পল্লব শ্যামল স্তরে স্তরে
বিসর্পিত বহু ঊর্ধ্বদেশে, মেঘ-'পরে
মেঘ যথা; নিত্য তার উদাত্ত মর্মরে
দেবতা-বন্দনা জাগে মত্ত বায়ুভরে,
ধবল স্ফটিক-স্বচ্ছ তুঙ্গ শৃঙ্গগণ
নীরবে দাঁড়ায়ে আছে স্তিমিত-নয়ন,
মগ্ন সবে ধূর্জটির ধ্যানে। নির্ঝরিণী
শিলাতটে বাজাইয়া বৈরাগ্য-রাগিণী
চলে যায় নিরুদ্দেশে। আকাশসভায়
স্বর্গবাসী দেবতারা নিঃশব্দ ভাষায়
নিত্য গাহে বৈরাগ্য-সংগীত। বহুদূরে
গিরিতলে ভৈরবের বিষাণের সুরে

কোণার্ক

ভীম শব্দ জাগে নিক্ষেপিত তুষারের
প্রচণ্ড পতনে। তপঃশান্ত বৎসরের
প্রতিটি প্রহর নিঃশব্দে কাটিয়া চলে
ধ্যানের আগ্নেয় মন্ত্রে, দীপ্ত হোমানলে।
শ্রান্ত সূর্য অস্ত গেল। ভুবন আবরি
নীরবে নামিয়া এল অন্ধ বিভাবরী।
কেটে গেল বহুক্ষণ ; বনলক্ষ্মীগণ
আশ্রমে ফিরিয়া যায় করিয়া বরণ
দেবী পার্বতীরে বিচিত্র কুসুমদামে।
চারিদিক জুড়ে গভীর স্তব্ধতা নামে
দুঃসহ ভীষণ।

পুঞ্জিত মেঘের ভারে
সহসা ভরিল দিশি ঘন অন্ধকারে,
ধ্যানস্তব্ধ মহাশূন্যে রুদ্র মহাকাল
সহসা মেলিয়া দিল উত্তরী করাল।
প্রবল ঝটিকা-বেগে কাঁপিল মেদিনী
দিকে দিকে ঝলকিল দৃপ্ত সৌদামিনী
বজ্রের গর্জনে। শৈলসুতা ধ্যানমাঝে
হেরিল পুলকে—নটরাজ রুদ্রসাজে
সতীদেহ স্কন্ধে ল'য়ে ফিরে নৃত্য করি,
জটাজাল মেঘে মেঘে দুলিছে শিহরি,
নহে সৌদামিনী, অপরূপ সতীশব
স্কন্ধে ল'য়ে নৃত্যে মাতি ফিরিছে ভৈরব।
ডম্বরুর রুদ্রতালে বজ্রের গর্জন
বিদারিয়া ছুটে চলে গগন-প্রাংগণ।

নিবিড় ধেয়ানমাঝে অপূর্ব স্বপন,
অশ্রুজলে ভরে এল উমার নয়ন।

সুকৃতির নাহি বুঝি সীমা; দেবতার
অশেষ সান্ত্বনারাশি, করুণা অপার
এল তার দুঃসহ দুর্দিনে।
ক্ষণপরে
উচ্চারিল শৈলসুতা যোগ-মগ্নস্বরে—
জানি আমি, "ধ্যানমাঝে আরাধ্য দেবতা
জীবনে ফিরিয়া আসে, সত্য এ বারতা।
ওগো মহেশ্বর, তোমারে পেয়েছি আমি,
নিভৃত ধেয়ান-পথে আসিয়াছ নামি
উমার অন্তরালয়ে। হে মহাসুন্দর
তব জ্যোতির্বিভাসিত বিশ্বচরাচর।
উমার হৃদয় আজি পরশে তোমার
ধন্য মানে আপনারে সর্বপাপ-ভার-
মুক্ত দেব-আত্মাসম। হে চির-শরণ,
জীবন মরণ মোর করিনু অর্পণ
চরণে তোমার।" মঞ্জু-কণ্ঠ ধীরে ধীরে
দূর দেশে ভেসে গেল নিশান্ত সমীরে।
সুগভীর বিরহের বৈতরিণী-তীরে
মিলন-সংগীত বুঝি উথলিল ধীরে।

রাত্রি হ'ল অবসান; উদয়শিখরে

কোণার্ক

উষার সুবর্ণময় স্যন্দন উপরে
সপ্তঅশ্ববল্গা ধরি জ্যোতির্ময় করে
সবিতা দাঁড়ালো আসি। দক্ষিণে উত্তরে
পূরবে পশ্চিমে অগণিত মণিময়
উত্তরীয় অপরূপ আলোক-বিস্ময়
তুলিল জাগায়ে।
তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ 'পরি
প্রভাত-আলোক-বন্যা পড়িতেছে ঝরি।
জ্যোতিঃস্নাত শৃঙ্গশ্রেণী, উমা জ্যোতির্ময়ী,
যেন শত শত অগ্নিহোত্রী কালজয়ী
ঋষিগণ যজ্ঞ করে উমারে ঘেরিয়া,
উমাদেহ হোমানলে উঠেছে জ্বলিয়া।
দূরলীন গিরীশের সর্বোচ্চ শিখর
দীপ্তি শুভ্রতম—যেন দেব মহেশ্বর।
যোগস্বপ্নময়ী উমা বিমুগ্ধ নয়ানে
পদ্মবীজমাল্য করে চাহি তার পানে
উঠিল চমকি। মুহূর্তে গেল যে ভাসি
কৃচ্ছ্রতা কঠোর, অসহ্য পুলকরাশি
গ্রাসিল সর্বাঙ্গমন। ভাঙিল ধেয়ান।
নেহারিল শৈলসুতা, প্রসন্ন-বয়ান
উমানাথ দাঁড়ায়ে সম্মুখে—হাসিখানি
অধর চুমিয়া বিদ্যুতের রেখাটানি
পড়েছে ঘুমায়ে, জটিল জটার ভার
ঘনকৃষ্ণ মেঘসম কাঁপে বারবার
শুভ্র গ্রীবাদেশে। সুদীর্ঘ তপস্যাশেষে

এল আজি পার্শ্বে তার নব-বরবেশে
উমার আরাধ্য ধন। দুটি নেত্র ভরি
বিন্দু অশ্রুজলে আনন্দ পড়িল ঝরি
মহেশ-চরণ-মূলে। দিগ্বলয়ে দূরে
আকাশ ধরণী বাঁধা মিলনের সুরে।

১৩৪১

———

বুদ্ধদেব

পূর্ণিমার পূর্ণ-ইন্দু গ্রাসিয়াছে রাহু,
অমঙ্গল অন্ধকার মেলি শত বাহু
পীড়িছে ধরণীতল। স্তব্ধ চারিধার।
রাত্রির প্রেতেরা শুধু করিছে চীৎকার
চন্দ্রমার শবাধার বাহি। অন্তহীন
আকাশের বিশাল বিস্তার বিমলিন
ধূসর আঁধারে, মরণের ম্লান মায়া
বিশ্ব-চরাচরে বেদনা-বিবর্ণ ছায়া
ফেলিয়াছে বুঝি।
'বিশ্রম্ভণ' প্রাসাদের
অলিন্দের-'পরে মর্ম্মাহত গৌতমের
পাষাণ-নিশ্চল মূর্তি দূর অনম্বরে
মেলিয়া উদার-আঁখি বেদনা কাতরে
নীরবে রয়েছে চাহি। বিজন গভীর
রাত্রি নিঃশব্দে বহিয়া চলে ; মৃত্যুস্থির
প্রাসাদের প্রতি কক্ষতল। রজনীর
আলোক-বিলাস নৃত্যময়ী রূপসীর
নূপুর-শিঞ্জন, লাস্যলীলা অনুপম
মহাকাল-করস্পর্শে স্বপ্নমায়াসম
বিলীন বিস্মৃতিমাঝে। মর্ম্মরমণ্ডিত
মণিময় স্তম্ভ শত দীর্ঘ বিলম্বিত
ফেলিয়াছে ধূসরিত ছায়া, মর্ম্মরের

জালায়ন-পথে ব্যথাক্ষুব্ধ আকাশের
চূর্ণিত আঁধার প্রাসাদ-অলিন্দতলে
পড়িতেছে ঝরি'।

'রোহিণী'—বহিয়া চলে
অশ্রান্ত কল্লোলে, ক্রূর কৃষ্ণ স্রোত তার
কুটিল নাগিনী-সম দংশে অনিবার
নিদ্রিত পৃথ্বীরে। উত্তরে হিমাদ্রিচূড়
মেলিয়া বিশাল আস্য করাল নিষ্ঠুর
গ্রাসিছে ধরিত্রী। তুষারিত মূর্তি তার
বিসর্পিল কৃষ্ণাভ্রের বিপুল বিস্তার,
কঠিন উদ্যত-বাহু রুদ্র মহাকাল
যেন রয়েছে দাঁড়ায়ে গম্ভীর ভয়াল
ছায়া ফেলি মরণের।

আকাশ-অংগণে
ধ্যান-মৌন নীরবতা। মানস-নয়নে
স্থির দৃষ্টি মেলি' গৌতম হেরিছে ধ্যানে
মরণের মুরতি কঠোর ; মৃত্যুগানে
মুখরিত জীবনের পঞ্চতন্ত্রী বীণা—
রূপময়ী বসুন্ধরা নিত্য বিমলিনা
কঠিন মরণ-স্পর্শে। জীব-যাত্রা-পথে
মরণের অভিযান জয়দৃপ্ত রথে,
দিকে দিকে উড়ে তার করাল উত্তরী।
নির্মম আঘাত হানি যুগযুগ ধরি
জীবনেরে পদে পদে করে সে প্রহত।
ব্যাধসম গুপ্ত থাকি' নিত্য শরাহত

করে সে মানবে। কান্ত তনু সুকোমল
সুকঠোর মৃত্যুঘাতে অতীব দুর্বল,
মুহূর্তে খসিয়া পড়ে শীর্ণ পুষ্পসম,
অপূর্ব ভাস্বর রূপ, তনু অনুপম
আঁধারে মিলায়ে যায় মরু-মরীচিকা,
নয়নে হানিয়া যায় মৃত্যুবিভীষিকা।
বিশ্বমাঝে নিত্য বাজে কালের বিষাণ
সহস্র জীবন-'পরে উড়িছে নিশান
রূপহীন মরণের। জীবনের মাঝে
শতেক সহস্ররূপে বিচিত্রিত সাজে
ক্ষণে ক্ষণে দোলায়িত মরণ-আভাস ;
গৌতম ফেলিল ধীরে সুদীর্ঘ নিশ্বাস'।
'নাহি পন্থা অন্যতর!' উঠিল শিহরি
তার সারা মর্মতল—আঁখি দুটি ভরি
উথলিল বেদনার ধারা। ধীরে ধীরে
আন্দোলিয়া কেশদাম উন্নমিত শিরে
দাঁড়াল গৌতম স্খলিত-জটিল-জটা
ধূর্জটির প্রায়, প্রতি অঙ্গে জ্যোতিশ্ছটা
উঠে সচকিয়া। 'নাহি পন্থা অন্যতর ?'
নিরন্তর প্রশ্ন করে আহত অন্তর।

রজনী বাড়িয়া চলে, রাহুমুক্ত শশী
চন্দ্রমার করজাল পড়িতেছে খসি
আলোক-প্রাবারে ঢাকি' সারা বিশ্বতল,
বনানী-নিকষে আঁকে খদ্যোত বিহ্বল

জ্যোতিঃস্বর্ণ-রেখা। গৌতম রয়েছে চাহি
দূরান্তরে মেলিয়া নয়ন। অবগাহি
জ্যোতির প্রপাতে কে যেন কহিল আসি
গৈরিক-বসনধারী সুন্দর সন্ন্যাসী
সম্বোধিয়া তারে—"আছে পন্থা অন্যতর,
ত্যজ বন্ধু, চিরতরে কৃত্রিম-সুন্দর
এই সংসারের সীমা, প্রজ্ঞার আলোকে
জীবের অমৃত-পন্থা হেরিবে পুলকে।"

গৌতম মুদিল আঁখি। সহসা জ্বলিয়া
উঠে নির্বাণ-প্রদীপ-শিখা সচকিয়া
গৌতমের অন্তর-আলয়। সংসারের
মোহ-ছবি সে আলোকতলে স্বপনের
মত সরে গেল দূরে। অমৃতের লাগি
উদ্বেলিত চিত্তমাঝে তৃষ্ণা উঠে জাগি',
সংকল্প ভাসিয়া উঠে—সংসার তেয়াগি
'নির্বাণ-অমৃত-স্পর্শে উঠিবে সে জাগি,'
জাগাইবে বিশ্বমানবেরে; দুঃখাতীত
জীবনের লভিয়া আস্বাদ, মৃত্যুভীত
মানবের জরা ব্যাধি বেদনা অপার
কামনা বাসনা ক্ষুদ্র নিত্য হাহাকার-
মাঝে ধ্বনিয়া তুলিতে হ'বে অমৃতের
আকাঙ্ক্ষা অসীম—মৃত্যুময় জীবনের
শাশ্বত সংগীত। তাহারে দানিতে হ'বে
প্রজ্ঞাদৃষ্টি অনাবিলা, যাহার বৈভবে

নিত্য হেরিবে সে মরণ-সমুদ্র-পারে
নির্বাণের মূরতি ভাস্বর, অন্ধকারে
আত্মার অমৃত-বিভা। জন্ম-মৃত্যুহীন
যুগযুগান্তর ধরি চিররাত্রিদিন
মহাকাল-কণ্ঠধৃত মধ্যমণিপ্রায়
নির্বাণ-নিলীন আত্মা মহামহিমায়
করিছে বিরাজ।

অপূর্ব আনন্দভরে
চিত্ত তার উঠিল উচ্ছ্বসি থরে থরে
বিকশিত পদ্মসম। দীপিল নয়নে
অপরূপ জ্যোতির্লেখা, পশিল শ্রবণে
বিশ্বচরাচর—তৃণ হ'তে তারাস্তোম
উদাত্ত গম্ভীর মন্দ্রে শিহরিত ওম্
ওম্ ওম্ রবে।

গৌতম হেরিল দূরে
উচ্চ গিরিতটমূলে সুমধুর সুরে
আলোক-কল্লোলে রোহিণী বহিয়া যায়,
তুষারিত হিমালয় দিব্য চেতনায়
বিভাসিত শুভ্র জ্যোতিষ্মান্। অনম্বরে
অজানিত সুরে স্তব্ধতা-গভীর স্বরে
ডাকিছে কাহারা। ধেয়ান-আনত-আঁখি
গৌতম নামিয়া চলে পদচিহ্ন আঁকি
সোপানের শিলাপটে। দুলিয়া দুলিয়া
উঠে দীর্ঘ ঋজু ছায়া। ভুবন ভরিয়া

কাঁপে নিঃসঙ্গ, গভীর রাত্রি—ধীরে ধীরে
গৌতম নামিয়া চলে।

সহসা এ কি রে,
শ্লথ কেন চরণের গতি ? কারে স্মরি
ধ্যানরত চিত্ত তার উঠিল শিহরি,
উত্তরী খসিয়া পড়ে। নিমীল-নয়নে
গৌতম হেরিল যেন, কুসুম-শয়নে
নিদ্রিতা প্রেয়সী, ক্রোড়ে পুত্র প্রিয়তম
উষসীর শুভ্র অঙ্কে শুকতারাসম
পবিত্র সুন্দর। মণিময় মর্মরের
বাতায়ন-পথে স্থিরদৃষ্টি শশাঙ্কের
অপরূপ দ্যুতি—ঝলকি ঝলকি উঠি
মাণিক্যের দীপ্তি হানি পড়িতেছে লুটি'
শ্বেত কক্ষতলে। সহসা আঁধার ঘোর
গোপারে ফেলিল ঘেরি' নির্মম কঠোর
ছায়া-মূর্তি প্রসারিয়া। নিদ্রা-মাঝে প্রিয়া
বিষাদ-করুণস্বরে উঠিল কাঁদিয়া।
বেদনা-বিহ্বল গৌতম রহিল চাহি,
চলেনা চরণযুগ ; শূন্য-পথে গাহি'
যায় কারা ;—"ত্যজ বন্ধু, কৃত্রিম-সুন্দর
এই সংসারের সীমা, বিশ্ব-চরাচর
কাঁদে তোমাতরে।" আঁখি-যুগ আবরিয়া
স্খলিত উত্তরীতলে গৌতম ছুটিয়া
চলে প্রাসাদ-অলিন্দ ছাড়ি শরাহত

কেশরীর মত ! দৃষ্টিপথে দীর্ঘায়ত
দেবতা সুন্দর নিয়ত ডাকিছে তারে।
সিদ্ধার্থ দাঁড়াল আসি প্রাসাদের দ্বারে
মন্ত্রমুগ্ধ-আঁখি। চন্দ্রমার শেষ আলো
পশ্চিমগগনপ্রান্তে নীরবে মিলালো।

১৩৪২

———

শবরী

অস্ত গেছে শ্রান্ত সূর্য, স্তব্ধতা গভীর
নেমে আসে ধীরে, ছায়াম্লান ধরণীর
সর্বাঙ্গ ভরিয়া। নীল স্বচ্ছ পম্পানীর
প্রসারিত তটতলে প্রশান্ত গভীর
স্থির শব্দহীন, যেন সুপ্ত দিগ্বধূর
সুনীল অঞ্চলখানি মূর্ছিত বিধুর
ভূতলে পড়েছে খসি'। দূর পরপারে
বিসর্পিত বনরেখা নীলিমা-সঞ্চারে
মিশিয়াছে মহা নভোনীলে। বিথারিয়া
নীলমায়া নীলাম্বর পড়েছে ঢলিয়া
দিকচক্রতলে।

শ্রমণী শবর-বালা
সরোবর-শিলাতটে একান্ত নিরালা
দাঁড়ায়ে নীরবে। পাণ্ডুতনু পরিক্ষীণ
নিরন্তর কঠোর সাধনে। স্বপ্নলীন
আধ-নিমীলিত আঁখি। ভাবিতেছে মনে
কোন মহা অন্বেষণে কেটেছে কেমনে
সুদীর্ঘ জীবন তার। নির্নিমেষ নীল
ভরিয়াছে আজি তার সমগ্র নিখিল,
সমগ্র অন্তর। অনন্ত সে নীলিমার
মাঝে শিহরিছে অপরূপ মূর্তি কার
শান্ত সুগম্ভীর, রহস্য-মধুর স্বরে

আবাহন জাগে কার দূর নীলাম্বরে।
শবরী চমকি উঠে। নীলিমা-পরশে
স্বপনবিহ্বল তনু নিবিড় হরষে
কাঁপে অনিবার। চারিদিক হ'তে তারে
নীল-স্বপ্নময়ী ধরা যেন বাঁধিবারে
চাহে ব্যগ্র বাহু-ডোরে।
একি বিড়ম্বনা!
নীলিমা বাঁধিবে তারে! নিমীল-নয়না
তাপসী শবর-বালা স্বপ্ন পরিহরি
নীল স্বচ্ছ পম্পানীরে ধীরে অবতরি
সমাপ্ত করিল স্নান। কমণ্ডলু ভরি
পূত পম্পা-সরোনীরে ফিরিল শবরী
মতঙ্গ-আশ্রম-পথে। আসন্ন সন্ধ্যার
ম্লানছায়া রচিয়াছে মোহ দুর্নিবার
ঘনবনমাঝে, সেথা পুন্নাগতমাল,
দীর্ঘচ্ছায়া-বিলম্বিত দেবদারু শাল
বিছায়েছে পুষ্পস্তরে দেবতা-কাঙ্ক্ষিত
বিচিত্রশয়ন। পত্রপুঞ্জে পল্লবিত
আনীল রহস্য-ছবি। বনপথ ধরি
বিতত বনানী-প্রান্তে ফিরিল শবরী
বিজন কুটিরদ্বারে।
তরল আঁধারে
শিহরিয়া চলে রাত্রি, বিটপী-মাঝারে
পল্লবনিলয়ে তার পক্ষবিধূনন
ধ্বনিছে মর্মরস্বনে। বল্কলবসন

আবরিয়া সর্বদেহে দাঁড়াল শবরী
স্বপ্ন-লীনা। স্মৃতিপদচিহ্ন অনুসরি
চিত্ত তার ফিরে গেছে সুদূর অতীতে,
মহর্ষি মতঙ্গ যবে একান্ত নিভৃতে
কহেছিল তারে—'ভদ্রে, অভীষ্ট তোমার
নয়নাভিরাম রাম, মহা তপস্যার
মাঝে পাইবে তাঁহারে। চেতনা-গহনে
নীরবে করিও ধ্যান।' বাজিল স্মরণে
সেই সুগম্ভীর বাণী। তাপসী শবরী
সন্তর্পণে ধীরে সপ্তপর্ণ-শাখা ধরি'
চাহিল সম্মুখে—কোথায় আরাধ্য তার!
বহুবর্ষ চলে যায়, নৈরাশ্য-আঁধার
শুধু জাগে চারিভিতে। ব্যর্থতা-পীড়নে
কাঁদিল অন্তর, অশ্রুবারি দু'নয়নে
পড়িল ঝরিয়া। অটবী-শয়নমাঝে
ঘন অন্ধকার ঘনতর হ'য়ে রাজে
পল্লবে জড়ায়ে। সকরুণ ঝিল্লীস্বরে
দিগ্বধূ কাঁদিছে কোথা দূর-দিগন্তরে।
নীরব পাষাণ-মূর্তি বিজন আঁধারে
ধেয়ান-নিশ্চল-তনু, তপস্যামাঝারে
পাষাণী অহল্যা কিগো আজো নিমগন!
আজো কি আসেনি তার আরাধ্যরতন
রাম। ধীরে অতি ধীরে সুষুপ্তি-সাগরে
ডুবে গেল শ্রান্ত তনু। রুক্ষভূমি-'পরে
লুটাল তাপসী। নিবিড় সে নিদ্রা ভরি

নামিল অপূর্ব স্বপ্ন—বর্ষ বর্ষ ধরি'
নিভৃত অরণ্য-পথে নিমীল নয়নে
কে রমণী ছুটে চলে অশ্রান্ত চরণে!
তপঃক্লিষ্ট-শীর্ণতনু নিদ্রাতন্দ্রাহারা
নিরন্তর বেগে ধায় উন্মাদিনী-পারা!
অরণ্য-মেঘের মাঝে পত্রচ্ছেদফাঁকে
নীলিমা-বিদ্যুৎ হানি' নীলাকাশ ডাকে
তারে অজানিত পথে। বৈরাগিনী সুরে
তার নিত্য গৃহ-হারা, অন্তহীন দূরে
চলিয়াছে নীল-অভিসারে। সন্ধ্যা আসে,
অজানা অরণ্য ঘেরি বিক্ষুব্ধ বাতাসে
মর্মরিয়া কাঁদে রাত্রি, দিগন্ত ভরিয়া
নামে দুর্ভেদ্য আঁধার। রমণী ছুটিয়া
চলে অন্ধ, দিশাহারা। বনে বনান্তরে
রোদনের প্রতিধ্বনি ব্যথাক্লান্তস্বরে
গুমরি কাঁদিয়া মরে।
দীর্ঘপথশেষে
বিক্ষত চরণে উত্তরিল অবশেষে
মুক্ত নীলাম্বরতলে। অন্তহীন নীল
নীরবে ভরিয়া দিল সমগ্র নিখিল।
নিষ্পলক-নেত্রে নারী রহিল চাহিয়া,
ধীরে ধীরে নীল মায়া উঠিল দুলিয়া,
ধীরে তার অভিনব হ'ল রূপান্তর—
অপূর্ব-শোভন-কান্তি আরাধ্য সুন্দর
রাম দিল দেখা অনন্ত নীলিমা ভরি'।

তাপসী শবর-বালা উঠিল শিহরি
আনন্দ-জাগ্রত-তনু। সম্মুখে শ্রীরাম
সুনীল নীরদ-রূপ নয়নাভিরাম।
তপস্যা সার্থক আজি। ধীরে, অতি ধীরে
তখন জাগিছে উষা পুণ্য পম্পাতীরে।

রবি-প্রদক্ষিণ

রবিরে ঘেরিয়া পৃথ্বী চলে নিশিদিন।
ছন্দে জাগে প্রাণস্পন্দ, অভিনব গীতি—
দোলে সিন্ধু, কাঁপে জল, চাঁদ হাসে নীতি,
গিরিশিরে মায়া নামে রহস্যনিলীন।
রবি তার প্রাণবহ্নি—স্পর্শ লভি' তার
শিহরে অরণ্য-নীল,—কাঁপে নীল ছায়া
কুসুমিত তৃণে তৃণে স্বপ্ন ধরে কায়া,
সৌন্দর্য-প্রবাহ চলে দিগন্ত-প্রসার।

হে কবি রবীন্দ্র, নবযুগে আরবার
ভারত জেগেছে তব জ্যোতিঃ-নেত্রতলে,
তুমি তারে দেছ প্রাণ—বাণী মৃত্যুহীন।
তোমার তপস্যামাঝে পেল যে আবার
আপন মহিমা খুঁজি—তাই, দেব, চলে
তোমারে ঘেরিয়া তার নিত্য-প্রদক্ষিণ।

১৩৪৮

লহ নমস্কার

শতবর্ষ পরে আজি দূর হ'তে দূর
ধ্বনিতেছে মন্ত্র তব উদাত্ত মধুর
এ বঙ্গের চিত্তভূমে, তাই দিকে দিকে
হেরিতেছি আমি আজি স্তব্ধ অনিমিখে,—
চলিয়াছে শোভাযাত্রা, কোটি কণ্ঠ-রোলে
উদ্‌ঘোষিত মাতৃস্তব, কালস্রোতে দোলে
জ্যোতির্ময়ী মাতৃমূর্তি অপূর্ব-শোভনা।
সুজলা, সুফলা, শ্যামা মর্ত্ত-অতুলনা।

হে ঋষি বঙ্কিম, লহ ভক্তি-নমস্কার,
ধূপের সুরভিসম প্রাণে যাহা মোর
উৎসারিত রাত্রিদিন, কর আশীর্বাদ
মাতার প্রসন্নদৃষ্টি, অমৃত-প্রসাদ
লভি যেন, যেন লভি চিত্ত ভরি মোর
সর্বার্থসাধিকা মূর্তি দেশ-মাতৃকার।

১৩৪৮

প্রেম

বেদনার ধূপ জ্বালি পূজিনু তোমারে,
বেদনা ধরিল মোর সুরময় রূপ।
হৃদয়-সর্বস্ব দিনু অর্ঘ্য-উপহারে,
শূন্যবক্ষে বাজে বাঁশি অপূর্ব অনুপ।
দুঃখের প্রদীপ লয়ে করিনু বরণ,
দুঃখদীপ ঝলি উঠে চন্দ্র-করোজ্জ্বল।
অশ্রুর মালিকা গাঁথি করিনু অর্পণ,
অশ্রু মোর ফিরে এল মুকুতা-ধবল।

এই তো প্রেমের রীতি,—সুধাবিষে ভরা,
এ জগতে সত্য কিবা আছে তার আগে?
হৃদয় ভাঙিয়া পড়ে, তবু মধুক্ষরা,
মনোহরা নাম তব জপি অনুরাগে।
এরি লাগি যুগে যুগে জনম-জঞ্জাল
ঘুরিবারে চাহি আমি প্রেমের কাঙাল।

১৩৪৬

আনন্দ

আচার্য শঙ্কর, জ্ঞানের সোপান বাহি
হেরিয়াছ, সবিতার দ্যুতিবিম্বপ্রায়
উৎসারিত বিশ্বসৃষ্টি নিযুত ধারায়
পরব্রহ্ম হ'তে, তিনি ছাড়া কিছু নাহি।
তুমি বলিয়াছ, রূপমুগ্ধ মানবের
দুঃখই চরম গতি, ধরণীর রূপে
মুগ্ধ তারা, নিমজ্জিত মোহ-অন্ধকূপে,
নিত্য পিষ্ট চক্রতলে রুদ্র মরণের।

মর-ধরণীর রূপে মুগ্ধ কবি আমি
নীরবে দাঁড়াই যবে প্রিয়মুখ চাহি,
চন্দ্রকর-রোমাঞ্চিত স্তব্ধাকাশতলে,
তত্ত্ব-চিন্তা ডুবে যায় আনন্দ অতলে।
মনে হয়, মৃত্যু কোথা! দুঃখ কিছু নাহি,
বিশ্বের আকাশ ভরি মুক্তি আসে নামি।

১৩৪৫

স্বপ্ন

স্বপন ঘনায়ে এল মগ্ন-চেতনায়—
তোমারে পেয়েছি যেন, দূর সিন্ধুতটে
বনানীর ছায়া-আঁকা পর্বত-সংকটে
চলেছি তোমার সাথে। নভঃ-কিনারায়
স্খলিত মাধুরীজালে মোহ বিচ্ছুরিয়া
হাসিছে অতন্দ্র শশী। নয়নে তোমার
মুকুলিত প্রেমদৃষ্টি, বাসনার সার।
বক্ষে তব করস্পর্শ রাখিনু কাড়িয়া।

স্বপন টুটিয়া গেল, কোথা তুমি প্রিয়া
চিরস্পর্শাতীতা! দূরতম নক্ষত্রের
মহাব্যবধান তোমারে লয়েছে দূরে,
আবরিয়া অন্তহীন বিরহের পুরে।
কেহ নাই : বিরলতা বন্ধ্য আকাশের,
আর রাত্রি মেঘময়ী আমারে ঘেরিয়া।

১৩৪৫

তোমারে পেয়েছি যেন

জানি সখি, জানি, তোমারে পাবনা আমি
পরশ-বন্ধনে। কল্পনার ইন্দ্রধনু,
বিচ্ছুরিত বর্ণস্তরে তব রূপতনু
স্পর্শাতীত রবে জানি চিরদিবা-যামী।
জানি সখি, জানি আমি :—দূর সিন্ধুপারে
স্বপ্নসম যে-মাধুরী জাগে ধীরে ধীরে
সুনীল আকাশ আর বনাঞ্চল ঘিরে
তারই মত রবে চির রহস্য-আঁধারে।

তবু জানি, ব্যথাম্লান বিধুর সন্ধ্যায়
বসিয়া একেলা যবে পূর্ণানদীতীরে
নিঃশব্দে ডুবিয়া যাই ধ্যানের তিমিরে,
সহসা ঘনায় স্বপ্ন মগ্ন-চেতনায়—
'তোমারে পেয়েছি যেন'—অপূর্ব স্বপন!
অশ্রুজলে ভরে আসে মুগ্ধ দুনয়ন।

১৩৪২

হে প্রিয় আমার

সম্মুখে সুদূরলীন বিশাল সাগর,
নীলোর্মি-নন্দিত তীর। ঘেরি দিগন্তর
চলমান গিরিশ্রেণী, ঘনবন-রেখা
আকাশে আঁকিয়া চলে শ্যাম চিত্রলেখা
স্বপ্নসম সুমধুর। চাহি অনিমেষ
মনে হ'ল এ কোথায়, এ কাদের দেশ!
যতদূর দৃষ্টি চলে অচেনা ধরণী
কোমলাভ-কান্তিময়ী বিচিত্র-বরণী।

তবু তৃপ্তি কোথা? ভরিতে নারিল হৃদি
গিরিশ্রেণী, নীলাকাশ, বনানী, বারিধি।
সকলি বিচ্ছিন্ন-কান্তি, বিমর্ষ, বিধুর,
হৃদয়ে জাগাল শুধু বেদনার সুর।
তোমারে হেরিনু যবে, হে প্রিয় আমার,
ত্রিভুবন বাঁধা প'ল হাসিতে তোমার।

১৩৪৫

বিরহে

একদিন দর্পভরে বলেছিনু প্রিয়া,
তোমা হ'তে শ্রেষ্ঠ মানি আমার জীবন,
ধরণী উদার আর সুনীল গগন।
তুচ্ছ তুমি তার কাছে। আমারে ঘেরিয়া
নিত্য বয়ে চলে যে বিচিত্র প্রাণ-ধারা,
জাগে যেই অনন্ত কল্লোল তুমি তার
কতটুকু! হেসেছিলে শুধু, বেদনার
মৃদুস্পর্শে কেঁপেছিল দুটি আঁখিতারা।

আজ তুমি নাই; একা আমি অন্ধকারে,
বিজন বেদনাঘন রাত্রি আসে নামি,
ধূসর আকাশ বক্ষ। বন্ধ্যা বিশ্বপারে
ফোটে নাকো ফুল, কল্লোল গিয়াছে থামি
বিষণ্ণ ব্যথায়। বিরস বিবর্ণ দিন,
তুমি ছাড়া জীবন যে পঙ্গু, অর্থহীন।

১৩৪১

অভয়

নৈরাশ্য কিসের, বন্ধু, জীবনে তোমার
দুঃখ যদি আসে নামি কিবা তাহে ক্ষতি ?
জীবন যে দুঃখজয়ী, কাল-সিন্ধু মথি
নিরন্তর যাত্রা তার মহা দূর-পার।
বিপদ্-বন্ধুর পথ, সান্ত্বনা কোথায় ?
কেন বা সান্ত্বনা ? চাহিয়া দেখিছ, বীর,
বিপদ্ বিস্ময়াহত ভয়ে নত-শির
শক্তির ভ্রূকুটি-ভরা দৃপ্ত মহিমায়।

জীবন অপরিমেয়, বেদনা অপার
কণামাত্র ক্ষতি তার সাধিতে না পারে।
মানব জড়তা-মুক্ত আঘাতে তাহার,
নেহারে অমিতশক্তি আপন আত্মারে।
দুঃখের ভূমিকা-'পরে মানবজীবন
শোভিছে নিকষশায়ী কনক-লিখন।

১৩৪৬

কোণার্ক

"সুন্দর এসে ঐ হেসে হেসে ভরি দিল তব শূন্যতা,
জীর্ণ হে তুমি দীর্ণ দেবতালয়।
ভিত্তিরন্ধ্রে বাজে আনন্দে ঢাকি দিয়া তব ক্ষুণ্ণতা
রূপের শংখে অসংখ্য 'জয় জয়'।"

—রবীন্দ্রনাথ

জন্মান্তর

চলেছি কোণার্ক-মন্দিরে, অর্কক্ষেত্রে আমার স্বপ্ন-তীর্থে,
সংগে আছেন বন্ধুরা, তাঁরা তিনজন।
সুদূরের মোহ টানছে আমাদের মনকে,
সুন্দরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আমাদের আঁখি,
ললাটে আমাদের অভাবনীয়ের আশীর্বাদ।
চলেছে গোবিন্দ, রঘুরাজ, গোরুর গাড়ীর চালক তারা।
কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ তাদের দেহ, পেশীবহুল গঠন,
যেন কালো-পাথরে-কোঁদা মূর্তি
হঠাৎ প্রাণ পেয়ে সচল এবং সকণ্ঠ হয়ে উঠেছে,
নিঃসঙ্গ দূর নিশীথ-পথের উপযুক্ত সাথী।
যাত্রা সুরু হ'ল—
আকাশ কালো মেঘে ঢাকা, বৃষ্টিতে ভেজা,
সমুদ্র কালোতর—
আদিম জল-দানবটা ফেনায়িত তরংগ-দংষ্ট্রায়
হাসির অট্টরোল তুলছে,
ক্ষণে-ক্ষণে প্রচণ্ড গর্জন ক'রে উঠছে।
আস্ফালনটা দেখবার মত, লোভ হচ্ছিল।
কিন্তু আমরা চলেছি মিত্রবনে—অর্কতীর্থে।
সুদূরের মোহ টানছে আমাদের মনকে,

সুন্দরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আমাদের আঁখি,
ললাটে আমাদের অভাবনীয়ের আশীর্বাদ !

পার হ'য়ে চলি জনতাভারাক্রান্ত নগরের পথ,
বিচিত্র ছায়াচ্ছবি, জীবনের অকারণ কোলাহল !
পার হ'য়ে চলি নগর-তলী,
মহানগরের জীর্ণতা-নির্মোক।
দিন আছে কি-না আছে ; হয়তো রাতের তিমিরে
গেছে মিলিয়ে।
অন্ধকারে হারিয়ে গেল জগন্নাথদেবের মন্দির-চূড়া।
গ্রামের মাঝে এসে পড়েছি ;
টুকরো কথা, হালকা হাসির ধ্বনি
স্তব্ধতার সমুদ্রে তুলছে শব্দের ঢেউ।
জানালার ফাঁকে হঠাৎ চোখে পড়ে
প্রদীপের কম্পিত শিখার একটুখানি,
আর কোন অপরিচিতার আনমিতা মুখের এতটুকু ছায়া।
এক ঝলক বাতাস দিয়ে গেল,
তাতে মেশানো আছে দূরাগত পাখির ডাক ,
আর সন্থ-ফোটা কোন অচেনা ফুলের গন্ধ,
আর হয়ত—হয়ত দূরশ্রুত সমুদ্রের বাণী।
আকাশের একাংশ চোখে পড়ছে,
আলোর ভারে ফেটে পড়বে বুঝি।
জরির পাড়-দেওয়া কালো মেঘের পর্দাখানা গেল সরে,
গাছের ফাঁকে দেখা দিল মস্ত বড়ো একখানা চাঁদ।
অপরূপ চাঁদ—কৃষ্ণপক্ষের প্রথম চাঁদ,
আলোর জাদুকর সূক্ষ্ম একখানা সোনার জাল দিল ছড়িয়ে।

কোণার্ক

গ্রাম বুঝি পেরিয়ে এলাম, সামনেই নোয়ানই *
নদীর জলে আলো পড়েছে ঝিকিয়ে।
কি রূপ! যেন দূর গ্রামের কোন গৌরাঙ্গী তন্বী
রাত হয়েছে দেখে ভয় পেয়ে ছুটে চলেছে,
জ্যোৎস্নালোকে তার ডুরে জংলা-সাড়ীর আঁচলখানা
উঠছে ঝলক দিয়ে।
টুকরো টুকরো পাথর দিয়ে তৈরি সাঁকো,
হেঁটে পার হ'তে হবে,—হেঁটেই চলি।
সাঁকোতে বসে মাছ ধরছে, কেমন যেন অদ্ভুত ছবি,
অর্ধরাত্রে দেখা সুন্দর স্বপ্নের একটুখানি,
যার সূচনা আছে কিন্তু সমাপ্তি নেই।

পার হ'য়ে এসে দাঁড়ালেম গ্রামের শেষপ্রান্তে—
সভ্য জগতের প্রান্ত-সীমানায়।
এর পরে বনপথ, দূরপ্রসারী, বিসর্পিল, অবারিত,
বনলক্ষ্মীর অজস্র দাক্ষিণ্যের ভারে অনন্যা।
পার হ'য়ে লিয়াখিয়া নদী।
নদীতট থেকে সুরু হবে তেপান্তরের ভূতুড়ে মাঠ,—
অবনীন্দ্রনাথের ভূতপত্রীর দেশ, দিক নেই, দিশা নেই,
শুধু পায়ের তলায় বালি চিক্‌চিক্ করে।
'পাল্কী চলে, কিন্তু এগোয় না।'
মানুষ-যাত্রী দিশা হারায়, হারায় পথ
হারিয়ে ফেলে আপনাকে।

* একটী ছোট নদী।

এ সূর্য-ডোবার মাঠ,
সূর্য এখানে অস্ত যায়, ফিরে আসে কি-না কেউ জানে না!
অন্ধকার এখানে অবয়বী হয়, প্রেতলোকের ছায়া নামে,
ঝিম্ আলোকে বালিয়াড়ি দংষ্ট্রা বিকাশ করে
প্রেতের স্তব্ধতা-ভয়াল অট্টহাসির মত।
কালো হরিণের দল ভয় পেয়ে ছুটে চলে,
তারা ছুটতে থাকে, ছুটতে থাকে—
তাদের পায়ের ধ্বনি পার হয়ে যায়
বিজন বালুকা-প্রান্তর—পার হয় বালিয়াড়ি,
তারপরে মিলিয়ে যায় বেলাবন-লগ্ন তিমিরে।
জ্যোৎস্নারাত্রি শরীরিণী মূর্তি ধরে ;
মায়াবিনী, পথিককে নিয়ে যায় পথ ভুলিয়ে।
হারানো নদীর আর্তস্বর শোনা যায়
বালুকাগহ্বরে হারিয়ে গিয়ে তারা কাঁদে।
পথিক ভূতাবিষ্টের মত পথ চলে—কোথায় জানে না,
অনেকক্ষণ, অনেকক্ষণ, কতক্ষণ তাও জানা নেই।
তারপরে প্রভাতের সংগে সংগে চোখে পড়ে
অভাবিত-পূর্ব সূর্যোদয়,
মহাকালের প্রশস্ত ললাটে রক্তিম সিন্দূর-বিন্দুর মতই
উজ্জ্বল, সুন্দর।

আর চোখে পড়ে—
ঝাউবন ছাপিয়ে উঠছে জগমোহনের চূড়া,
কোণার্ক সূর্য-মন্দির,—আলোকের জয়ধ্বনি,
অমৃতায়মান পাষাণ-মহিমা।
এ পথ নাকি সজ্ঞানে কেউ পার হ'তে পারে না।

কোণার্ক

এই পথে আমরা চলেছি—
সুদূরের মোহ টানছে আমাদের মনকে,
সুন্দরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আমাদের আঁখি,
অভাবনীয়ের আশীর্বাদ আমাদের ললাটে।
গাড়ি চলেছে বনের পথ ধরে,
তিনজনে হেঁটে চলেছি—
বনের পথ আঁকা-বাঁকা, আলো-আঁকা, ছায়াছকা।
দুধারে বন-ঝাউএর সারি, ঘন সবুজের ঢেউ,
নৃত্য-চপল বিচিত্র ঢেউ।
পল্লবে পল্লবে জড়িয়ে জড়িয়ে নেমেছে জ্যোৎস্না,
আলোক-জাহ্নবীর সহস্রবেণী ধারা।
তারা গড়িয়ে গেছে, ছড়িয়ে পড়েছে, গেছে হারিয়ে!
মাঝে মাঝে হু হু ক'রে বাতাস দেয়;
সমস্ত পথটি যেন থর্ থর্ ক'রে কাঁপতে থাকে।
নিস্তব্ধ—নির্জন,
হঠাৎ মনে হ'ল, কারা যেন দুড়্দাড়্ করে
যাচ্ছে পালিয়ে,
কারা এসেছিল? বনপরীরা?
আলোকের চুমকি-বসানো সবুজ ওড়নার আভাসটুকু
এখনো যায়নি মিলিয়ে।
পার হ'য়ে চলেছি জ্যোৎস্নারাত্রির দেশ,
রূপকথার রাজত্ব, স্বপ্নের মহল।

দূরে দূরে ঝলমল ক'রে উঠল গলিত কাঞ্চনধারা লিয়াখিয়া,
বালুতটের পাড় ঘেঁষে একান্তে বয়ে চলেছে—

হলদে সাড়ির জ্যোৎস্নার বুটিদেওয়া জমকালো
সোনার পাড়ের মত।

লিয়াখিয়া তীরে এসে গিয়েছি,
লিয়াখিয়া—লিয়াখিয়া—বড় মিষ্টি নাম, মনকাড়া নাম।
এই নদীতটে, সুদূর অতীতে—
আজ থেকে চারশো বছর, না তার চেয়েও বেশি দিন আগে,
কোণার্ক থেকে ফিরছিলেন ভগবান চৈতন্যদেব,
কষিত-কাঞ্চন-কান্তি দেহ,
অমিয়-ছানিয়া গঠন,
আয়ত লোচনে বিগলিত করুণার ধারা।
ক্ষুধার্ত—তৃষার্ত তিনি, ভেঙে-পড়া অবসাদে
বসে পড়েন এই নদীতটে।
সন্নিহিত কুটির থেকে অর্ঘ্যহাতে বেরিয়ে আসে
বাৎসল্যের প্রতিমা—বৃদ্ধা শবরী, পুণ্যবতী নারী।
ভগবানের চরণে নামিয়ে রাখে তার খইএর ডালা,
যেন রাশি রাশি শুভ্র মল্লিকা,
তিনি তৃপ্ত হন।
মনে পড়ে গেল আরেক দিনের কথা,
আড়াই হাজার বছর আগে ভগবান তথাগত
সুজাতা-নিবেদিত পরমান্ন-প্রসাদে এমনি করেই
হয়েছিলেন পরিতৃপ্ত।
যুগে যুগে এমনই আমার দেবতার লীলা।

নদীতটে বসে পড়ি—
এইখানে বালুর অতলে কোথায় হয়ত
লুকিয়ে আছে তাঁর পদরজ।

পেয়েছি—পেয়েছি, কই হারায়নি তো!
ওই তো বয়ে চলেছে লিয়াখিয়া
আমার ঠাকুরের অংগকান্তি নিয়ে চলেছে বয়ে,
এমনি করে চলবে চিরদিন।
লিয়াখিয়া—লিয়াখিয়া—লিয়াখিয়া
ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থ
প্রণাম—প্রণাম।

এবার লিয়াখিয়া পারে ভূতুড়ে প্রান্তর,
ভূতপত্রীর দেশ—মৃত্যুপুরীর রহস্যে ঘেরা,
জন্মান্ত-অন্ধকারের দেশ।
আমরা তিনজনে হেঁটে চলেছি—
সুদূরের মোহ টানছে আমাদের মনকে,
সুন্দরের ধ্যানাবেশে স্বপ্নমগ্ন আমাদের আঁখি,
অভাবনীয়ের আশীর্বাদ আমাদের ললাটে।
সামনে দিশে-হারা বালুকা-বিস্তার,
উদাত্ত হাহাকারের ভয়াবহ প্রত্যক্ষতা,
অন্ধকার যেখানে অবয়বী হয়, প্রেতলোকের নামে ছায়া,
আর জ্যোৎস্না যেখানে শরীরিণী হ'য়ে
মায়া-মৃগীর মত মানুষকে নিয়ে যায় ভুলিয়ে।
আমরা চলেছি—
পিছনে দূরে পাঁচখানা গোরুর গাড়ি ছায়াপ্রাণীর মত চলেছে—
একঘেয়ে কর্কশ অপার্থিব একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে,
শব্দটা বুঝি উঠছে বালুর সংগে চাকার সংঘর্ষে।
কি জানি! হয়তো তাই!

কেউ বা আছেন ঘুমিয়ে, কম্বল মুড়ি দিয়ে,
কেউ বা আছেন আধো-জাগ্রত,
আমাদের অবস্থা স্বপ্ন-জাগর।
নিঃশব্দেই চলেছি—কথা গেছে ফুরিয়ে,
অননুভবনীয় স্তব্ধতা!

দূরে বালিয়াড়ি ঝক্‌ঝক্ করছে—
বালিয়াড়িই তো? না নিশীথিনীর অট্টহাসি?
ছড়িয়ে আছে লক্ষ-কোটি বহ্নি-তীক্ষ্ণ হীরার কুচি।
নিজেরই নিশ্বাসের শব্দে চমকে উঠে পিছন ফিরে চেয়ে দেখি,
ভয় পাই—স্তব্ধতা বুকের উপরে চেপে বসে।
রাত্রি যেন মহাপ্রান্তরে কার ধ্যানের আসন পেতে দিয়েছে,
দেবতারা আকাশে নক্ষত্র-প্রদীপ জ্বালিয়ে কার অপেক্ষা করছে!
চলেছি একান্ত সন্তর্পণে—
চলতে চলতে জানি না কখন থেমে গেছি,
দাঁড়িয়ে পড়েছি।
হঠাৎ কে যেন বললে, চেয়ে দেখুন আকাশের দিকে,
তাইতো একি?
অন্তহীন আকাশতলে বহুরূপী একখণ্ড মেঘে
রচিত হ'য়েছে অদ্ভুত সুন্দর এক বিরাট মূর্তি।
মুখে তার অপূর্ব দীপ্তি,
বিরূপাক্ষ ধ্যানে বসেছেন,
অনুত্তরংগ সমুদ্রের মত প্রশান্ত,
অনির্বাণ-শিখা প্রদীপের মত স্থির, নিশ্চল।

কোণার্ক

চেয়ে আছি—
ঘন নিশ্বাসের শব্দে ভয় পেয়ে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখি,
তাইত, এ মহাকায় বৃষ কোথা থেকে এল ?
বসতি-বিহীন বিজন প্রান্তরে বৃষরাজ ?
না, না, মায়া নয়, স্বপ্ন নয়, মতিভ্রম নয়,
সত্য দেখেছি—আমি সত্য দেখেছি।
তার পর এ কিসের শব্দ ? সমুদ্র-গর্জন ?
না, শোনা যাচ্চে কাদের মিনতি-করুণ প্রার্থনা ?
কারা কাঁদছে—কেঁদে চলেছে কারা !
ধ্যানমগ্ন যোগিবরকে হবে জাগাতে,
তাই কি এই নিখিল-প্লাবী ক্রন্দন-রোল ?

এ কোথায় ? এ কাদের দেশ ?
বর্তমান আমার কাছে সীমা হারিয়ে ফেলছে।
দেশ নেই—কাল নেই,
ছায়া হ'য়ে—মায়া হ'য়ে সব যাচ্ছে মিলিয়ে—
সব যাচ্ছে হারিয়ে।
আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছি, ডুবে যাচ্ছি—
চেতনা-বেদনাবন্ধ বুঝি টুটে টুটে,
এমন সময়ে বেলালগ্ন বনের দিক থেকে ভেসে এল,
কার মর্মান্তিক আর্তনাদ—জীবনের অন্তিম সংগ্রাম
কে বুকফাটা চীৎকার ক'রে উঠল কেঁদে—
মুহূর্তের জন্য ফিরে এলো দেহে চেতনার ঝলক্,
সেই ক্ষণ-চেতনার তীব্র ঝলকে
হেমন্তের কুহেলি-ভরা আকাশ-তলে

বিদ্যুতাভাসের মত ঝলসে গেল—
অর্ক-ক্ষেত্র, মিত্রবন,—জগমোহনের চূড়া,
মঠ—মন্দির, মূর্তি,
আর, আর, আমার জন্মান্তর।

ধর্মপদ

সাতশো বছর আগে,
অতীতের কোন এক বিস্মৃতি-লীন দিবসে
কলিংগাধিপতি মহারাজ নরসিংহদেব আদেশ দিলেন,
নগরীর উপকণ্ঠ হ'তে দূরে
ঊর্মি-মন্ত্রমুখর বিজন জলধি-তটে
গড়ে তুলতে হবে ভগবান হিরণ্যদ্যুতির উদ্দেশ্যে
কোণার্ক-মন্দির, পাষাণে ঝংকৃত আলোক-স্তুতি,
শিলা-সম্ভব মহা ওঙ্কারধ্বনি।
পূর্বমুখে দাঁড়িয়ে,
তিমির-গহন নিশীথ-প্রান্তে দাঁড়িয়ে
তিনি নিবেদন করবেন আলোক-প্রণাম,
করবেন সূর্যকে বন্দনা।
সবিতার প্রসন্ন দ্যুতি এসে পড়বে মুখে
জ্যোতির্ময় আশিসের মত, পূর্বজনমের সুকৃতির মত।
দূরে দূরে বালিয়াড়ির চূড়ায় চূড়ায়
আলো উঠবে ঝলক দিয়ে,
সমুদ্র আলোক-কল্লোলে ভেঙে পড়বে তীরে।
জীবনে লাগবে অমৃতের স্পর্শ,
ধন্য হবেন তিনি।

শিল্পি-গোষ্ঠী-চূড়ামণি বিশু মহারাণা
বারশো শিল্পীর মহাধিনায়ক তিনি

প্রতিভার বরপুত্র তিনি, পাষাণ-শিল্পে অলোক-সামান্য তাঁর দক্ষতা
অন্তরে "শান্তং শিবং অনন্তম্"—রসের সমুদ্র।
তাতে দোলা লাগে, ঢেউ খেলিয়ে যায়
পাষাণের বুকে জেগে ওঠে সুন্দর।
পাষাণ হ'য়ে ওঠে তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা
স্তনভারে আনমিতা নিম্নগ্নমধ্যা নারী।
ধ্যানময় চোখের বিচিত্র ভাবের আগুন
বাটালির ঘায়ে টুকরো টুকরো হ'য়ে
পাষাণ-মূর্তির আনত আঁখির তলে
পরিয়ে দেয় দৃষ্টির প্রদীপ।
জানি না কোন কুহক-মন্ত্রে আকাশের বিদ্যুৎপুষ্প
নারী-কটাক্ষে ধরা পড়ে,
আর পাষাণে পাষাণে জাগে বসন্তের স্ফুরিত-পুষ্প বিলাস।
দিকে দিকে বয়ে যায় লাবণ্যের ঢলঢল প্রবাহ।
শিল্পই তাঁর দেবতার আরাধনা,
তিনি জানেন 'শিল্পানি সংশন্তি দেব-শিল্পানি।'

মন্দির গড়ে উঠছে; অদ্ভুত বিচিত্র মন্দির,
যেন পাথরে নির্মিত হোমশিখা দূর-নভোমুখী,
যেন পাষাণের উচ্চতবাহু আলোক-বন্দনা।
বারশো শিল্পী গড়ে তুলছে বৎসরের পর বৎসর ধরে।
বিশু মহারাণার স্বপ্নকে করছে রূপায়িত—
নিরবচ্ছিন্ন তাদের নিষ্ঠা—অধ্যবসায় তাদের অন্তহীন।
তারা জানে, মহিমাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে
শাশ্বত কালের জন্য।

মহাকালের কণ্ঠে পরাতে হবে দিব্যদ্যুতি মণিহার
যার জ্যোতিতে মুগ্ধ মহাকাল মুহূর্তের জন্য দাঁড়াবে থমকে
অন্যমনে প্রলয়ের ছন্দ যাবে ভুলে,
আর সেই ক্ষণ-অবসরে চির-কালের সম্পদ্ পড়বে ঝরে।
মানুষের কীর্তি হ'বে চির-ভাস্বর—মৃত্যুঞ্জয়ী।

একটানা কর্মের প্রবাহ চলে—অন্তহীন অনবচ্ছিন্ন,
কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই,
নিরবসর, একেবারে নিরেট।
তবু কোথায় যেন কি অঘটন ঘটছে।
শিল্পিপতির মনে শান্তি নেই।
তন্দ্রাচ্ছন্ন ক্লান্ত অবসরে কে যেন ডাকে।
মনে পড়ে, দূর গ্রাম-প্রান্তে কুটির-অংগনে নেমেছে ছায়া,
সপ্তপর্ণশাখা ধরে অপেক্ষা করছে নারী, যৌবন-ভারাবনতা নারী,
কতকাল—কতকাল!
ঘরেতে প্রদীপ-জ্বালা—আলোকোদ্ভাসিত
নবজাত কুমারের মুখ।
শিল্পের মহা আহ্বানে তাদের ফেলে এসেছেন তিনি।
দৃষ্টি তাঁর ঝাপসা হ'য়ে আসে।
ভাবেন তিনি, এ দুর্বলতা কেন?
একনিষ্ঠ সাধকের শিল্পচর্যায় এ যে ব্যাঘাত।
রাণা মনকে কঠোর ক'রে তোলেন, ক'রে তোলেন দৃঢ়তর।
স্নেহের দুর্বলতায় দেবতা বুঝি হবেন বিরূপ—
হায়রে, দেবতা যে কোন ফাঁকে ফিরে যায়!

মন্দির গড়ে উঠছে, অপূর্ব অদ্ভুত মন্দির ,
বারশত শিল্পীর সুকঠোর শিল্পচর্যা।
বিশু মহারাণার স্বপ্নকে করছে তারা রূপায়িত,
অত্যুগ্র তাদের দৃষ্টি, নিষ্ঠুর তাদের নিষ্ঠা,
অধ্যবসায় তাদের অন্তহীন।
বারশো শিল্পীর সাধনার ধন মন্দির উঠেছে গড়ে
বিজন বালুকা-প্রান্তরে,
যেখানে বালিয়াড়ি ঝক্‌ঝক্ করে,
আর যেখানে বেলাবলয়িত সুদূর-লীন দুরন্ত সাগর।
লাবণ্যের জোয়ার বয়ে যাচ্ছে,
'কান্তি হেথায় চির-বিরাজিত
যৌবন ক্ষয়হীন।'
কিন্তু এ কার কান্তি ? কার যৌবন ?
পুরুষ করেছে সাধনা, গড়ে তুলেছে
অবিনশ্বর কীর্তির ভাস্বর চূড়া,
আপনাকে দান করেছে, পেয়েছে তার বহুগুণ পুরস্কার।
আর নারী করেছে নিভৃত নয়ন-জলে আত্মবিলুপ্তির তপস্যা,
নিপীড়িত করেছে রূপকে,
নিগৃহীত করেছে যৌবনকে
নিঃস্বার্থ ত্যাগের পঞ্চাগ্নিতপস্যায়।
তারই পরে গড়ে উঠেছে অদ্ভুত এই মন্দির।
পুরুষ সে-কথা জানে না।
তাই কি সমাপ্তির মুখে পড়ল বাধা ?
বড়-মন্দিরের চূড়ায় কিছুতেই কলস বসানো গেল না।
ব্যর্থ হ'ল শিল্পিপতির বারশো শিল্পীর সাধনা।

কোণার্ক

শিল্পিপতির মুখ গম্ভীর; বারশো শিল্পী
লজ্জায় ক্ষোভে ম্রিয়মাণ।

এমন সময়ে এল ধর্মপদ, বিশু মহারাণার
ফেলে-আসা সন্তান।
নারী বুঝি পাঠালে তার শেষ নিশ্বাস—শেষতম অর্ঘ্য।
আজ সে তরুণ, নবারুণ-দ্যুতি ধর্মপদ,
সুদীর্ঘ সুঠাম দেহ, অগ্নিরসে-ঢালা, শ্যামবহ্নি-শিখা,
প্রতিভার নিঃসংশয়িত স্বাক্ষর তার দৃষ্টিতে।
তাপসী মার কাছে তার শিল্প-দীক্ষা, সে দীক্ষা অগ্নিদীক্ষা।
দিনের পর দিন সে তার মাকে,—তপঃকৃশা পার্বতীকে দেখেছে
কখনও মনে হ'য়েছে সঞ্চারিণী দীপশিখা,
ললাটে সিন্দূর-বিন্দু, মূর্তিময়ী কল্যাণী।
কখনও মনে হ'য়েছে তীক্ষ্ণ-দীপ্তি বিদ্যুল্লতা, মূর্তিমতী তপস্যা।
আশৈশব সে স্তন্যপান করেনি, পান করেছে অগ্নিরস
তাই মূর্তি তার দীপ্তানলার্ক-দ্যুতি—অতুলন-কান্তি।
পিতাপুত্রে ঘটল পরিচয়।
ধর্মপদ দেখলে তার পিতাকে
আজীবনের বিস্ময়কে—সাধনাকে।
কিন্তু একি নৈরাশ্যের ছায়া, অবসাদের ক্লিষ্টতা
রয়েছে সে মুখে।
রয়েছে বারশত শিল্পীর বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে।
সে শুনতে পেলে, মন্দির নির্মাণের দীর্ঘায়ু মেয়াদ
শেষ হ'তে চলেছে!
স্বল্প কয়দিন বাকি;

তার মধ্যে মন্দির শেষ না হ'লে
যথাদিনে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা হবে না,
প্রত্যবায় ঘটবে।
সেই অপরাধেরাজ্ঞাদেশে নামবেনিষ্ঠুর শাস্তি, হয়তো মৃত্যু ।

প্রতিভাদীপ্ত তরুণ কিশোর দেখতে চাইলে সে-মন্দির।
বিদ্রূপের ঝড় ব'য়ে গেল,
শোনা গেল ক্ষুরধার তীব্র শ্লেষের শাণিত ঝঙ্কার
কিশোরের অনুচিত স্পর্ধায়।
অবশেষে বিনম্র কাকুতি তারে দিল পথ—
ধর্মপদ—অগ্নি-দীক্ষিত-সন্তান ধর্মপদ কলস দিল বসিয়ে,
দিকে দিকে উঠল জয়ধ্বনি, 'জয় ধর্মপদের জয়।'

শিল্পীদের মুখ গম্ভীর হ'য়ে ওঠে,
দৃষ্টি হয় ভ্রূকুটি-কুটিল,—
মহারাজের কানে একথা গেলে
তাদের গ্লানি, তাদের পরাজয়
অবধারিত তাদের নিষ্ঠুর মৃত্যু।
বারশো শিল্পীর সাধনার ভয়ংকর করুণ পরিণাম।
ভীত তারা, ক্ষুব্ধ তারা, অন্ধ তারা হীন ষড়যন্ত্র করলে ।
তারা প্ররোচিত করলে বিশু মহারাণাকে—
পিতাকে হত্যা করতে হবে পুত্রকে,
নষ্ট করতে হবে এ-ঘটনার জড়।
বিমূঢ় পিতা পুত্রহত্যায় উদ্যত হ'ল—
পিতৃস্নেহ দিল বাধা, খড়্গ পড়ল খসে।

ধর্মপদ শুনলে এ-কথা,
পিতার মর্মান্তিক বেদনার কাহিনী।

অগ্নিব্রত সন্তান, উজ্জ্বল হ'ল তার মুখ,
ত্যাগের অগ্নিস্নানে-শুচি সে জানে মার কথা,
মহাজীবনের কথা।

তার কাছে এল সেই মহাজীবনের আহ্বান,
মহাসুন্দর এলো মহাভয়ংকরের বেশে,
ঝাঁপিয়ে পড়ল সে মন্দির-সংলগ্ন কূপে,
অতলান্ত মরণ-গহ্বরে।

বরণ করলে মৃত্যু।
নারী দিল তার শেষতম অর্ঘ্য—
তার হৃৎপিণ্ড,
আর মন্দির হ'ল সম্পূর্ণ।

১৩৫৭

কোণার্ক সূর্য-মন্দির

দেখে এলুম কোণার্ক সূর্য-মন্দির,
সমুদ্র-কল্লোল-মুখর বিজন বালুকা-বেলায়,
পাষাণে-গড়া অদ্ভুত এই স্বপ্ন—
কোটি কোটি মানুষের মহাপ্রণাম
নমিত রয়েছে এখানে
জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ ভগবান সবিতার উদ্দেশ্যে।
তমিস্রান্ধ ভীষণ রাত্রির পারে দাঁড়িয়ে
তামস-গহন-মগ্ন মানুষ দেখেছে
মহাদ্যুতির 'তিমির-বিদার উদার অভ্যুদয়'।
তারা তাঁর জয়ধ্বনি উচ্চারণ করেছে,
তাঁকে জানিয়েছে প্রণাম,
'জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥'
চিরন্তনী মানুষের এই আলোক-সাধনা,
'তমসো মা জ্যোতির্গময়'।
এই বাণী মানুষের অন্তরাত্মার চিরকালের বাণী।
এই বাণীর ধারা বয়ে চলেছে—
অনাদি অতীত থেকে অন্তহীন ভবিষ্যতের পানে
উপনিষদের ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে এই বাণী,
উচ্চারিত হয়েছে এই বাণী বোধিদ্রুমতলে
ভগবান তথাগত বুদ্ধের জীবনপণতপস্যায়,

কোণার্ক

এই বাণীর অপূর্ব রূপায়ন দেখেছি
মৃত্যুপথযাত্রী মহাঋষি কবির অন্তিম মিনতিতে
আরো আলো চাই—আরো আলো।
ভারতবর্ষের আত্মা নীলোর্মি-নন্দিত বালুকাময় নৈঃশব্দ্য-মন্দিরে
এই বাণীর পরম মূর্তি গড়ে তুলেছে
অনুপম সৌন্দর্যে খচিত এই পাষাণে।

দেখতে পেলুম, এই পাষাণীকে ঘিরে বয়ে চলেছে—
নিত্যকালব্যাপী আনন্দরূপমমৃতম্-এর অবিরল প্রবাহ,
বহির্গাত্রে মদনোৎসবের চরম বিকাশ,
যৌন-লীলার রসোচ্ছল ছবি,
মকর-কেতু উড়ছে মধুপবনে,
জ্বলছে উন্মত্ত কামনার লোলুপ লেলিহ শিখা,
রতি-বিলাসের উদ্ধত, উদ্ধত, বিজয়-নিশান।
কিন্তু অন্তরে—'বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ।'
একা তিনি, স্তব্ধ তিনি, বৈরাগ্যের মহিমায় প্রশান্ত সুন্দর!
'অকূল শান্তি সেথায়, বিপুল বিরতি।'
প্রাণের বিচিত্রলীলাকে মিলিয়ে নিয়ে একটি অখণ্ড-ধারা।
চলেছে অভিনব মূর্তি-মিছিল—
কেউ স্থির হ'য়ে নেই,—অন্তহীন অবিরাম চলা।
ঘূর্ণ্যমান রথচক্র, ধাবমান অশ্ব,
নৃত্যপরা রমণী, বাদিত্রবাদিনী মধুরা, মধুদা,
বাজিয়ে চলেছে করতাল, মৃদঙ্গ, বীণা, বাঁশরী ও মন্দিরা,
আমি শুনতে পেয়েছি অশ্রুত মহাসংগীতের একতান-ধ্বনি।

পূর্বদিগন্তে সূর্যোদয়ের সূচনা জাগে,
অপরূপ সূর্যোদয় !
অন্ধকার-দানবটা মূর্ছিত হ'য়ে পড়ে,
উষা, প্রত্যুষার অর্কবাণে বিদ্ধ হ'য়ে
মুহুর্মুহু রক্ত-মোক্ষণ করতে থাকে।
আকাশ হ'য়ে ওঠে লালে লাল,
আর এই রক্তসীমান্তপারে চোখে পড়ে
অবারিত জ্যোতিঃ-প্রান্তর।

দুর্ধর্ষবেগে ছুটে আসে সপ্ত-তুরংগম—ধাবমান বহ্নিবন্যা,
অভিরাম তাদের গ্রীবাভংগ, জয়দৃপ্ত পদক্ষেপ,
স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে অগ্নিস্রাবী নিশ্বাস,
আন্দোলিত-ঘন কেশরদামে পুঞ্জিত বিদ্যুতের ঝলক,
আসছে, আসছে, ছুটে আসছে তারা
তিমিরান্ধ নিশীথ-অরণ্য পার হ'য়ে আসছে ছুটে।
শোনা যায় তাদের উল্লাস-হ্রেষা
তাদের ক্ষুরাঘাত-সমুত্থিত উদ্দাম-ধ্বনি।
আধেক দেখা যায় অরুণ-রথচূড়া,
ওইতো, ওইতো, হিরণ্যদ্যুতি সবিতার বিশ্ববিমোহন হাসি,
আলো ঝরে পড়ছে—পড়ছে ঝরে।
দিগন্ত পরিপ্লাবিত হ'য়ে গেল,
অরণ্যানী শ্যামাগ্নি-শিখায় ঝলমল করে উঠল।

নবারুণালোকে দেখি, আমার পাষাণী
সদ্যোমাত্র সূর্যপ্রণাম সেরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে—

কোণার্ক

ললাটে অর্ক-আশীর্বাদ পরিয়েছে জ্যোতির টীপ
মুখে লেগে আছে পূজার্থিনীর বিনম্র মধুর হাসি।
আমিও প্রণাম করেছি, নিবেদন করেছি,
'হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্মায় দৃষ্টয়ে!'
উচ্চারণ করেছি—
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥'
বলেছি, হে পূষণ সংহরণ কর তোমার তেজোরাশি,
'যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি।'

আবার আসন্ন নিশীথের প্রায়ান্ধকারে
মেঘরন্ধ্রচ্যুত ম্লান সূর্যের অন্তিম দ্যুতি এসে পড়েছে মুখে
রক্তাম্বরা দেখেছি আমার পাষাণীকে
কী ভয়ংকর, অর্ধরাত্রে-দেখা অদ্ভুত স্বপ্ন,
যেন খুবলে-খাওয়া চাঁদ।
কৃষ্ণকায় প্রস্তর-কংকালে পরিকীর্ণ প্রাংগণ,
শূন্য বেদীতল—রিক্ততার স্তব্ধীভূত করুণ হাহাকার।
এ কোন ভয়াবহ শ্মশানে এসে দাঁড়িয়েছি,
দেখেছি মহাকালের সুস্পষ্ট পায়ের চিহ্ন,
শুনেছি হঠাৎ হাসির ধ্বনি, মহাকাল হেসে ওঠে।
সে হাসির অট্টরোল ঝাউগাছের শিরে শিরে
পার হ'য়ে চলে,

পার হ'য়ে যায় বিজন, ভীষণ বালুপ্রান্তর,
বালিয়াড়িতে পাক খেয়ে পার হ'য়ে চলে
তরংগতর্জিত সংক্ষুব্ধ সমুদ্র, চলে যায় আরও আরও দূরে,
অস্তরবির দেশ ছাড়িয়ে।
ভয়চকিত হ'য়ে ফিরে আসি।
রাত্রির অন্ধকার দিগন্ত গ্রাস করে ফেলে।
তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে স্বপ্ন নামে—ভয়ংকর স্বপ্ন—
কে, কারা যেন কাকে খুঁজে ফিরছে,
প্রাংগণে নেমেছে শত শত প্রেতায়িত ছায়া,
তারা আর্তনাদ করছে—গগন ছাপিয়ে ওঠে
সে ক্রন্দনের রোল।
কে যেন এসে দাঁড়ায় মন্দির-লগ্ন কূপতটে,
অশ্রুগলিত চোখে নিচের দিকে চেয়ে—চেয়ে থাকে—
কে জ্যোতির্ময় কিশোর দেবতা যেন তলিয়ে যাচ্ছে,
আরও—আরও নিচে যায় তলিয়ে
গুহারাক্ষসীর নিরন্ধ্র অন্ধ অতলান্ত গভীরে।
প্রেতায়িত সেই ছায়া অসহায় আর্ত চীৎকার করে ওঠে,
'মুক্তি দাও, মুক্তি দাও!'
কে, কারা এরা সব অভিশপ্ত আত্মা?

দিবসের স্পষ্ট আলোকে শুনেছি মন্দিরের ইতিহাস,
মর্মান্তিক কাহিনী।
শুনেছি তরুণার্কদ্যুতি তরুণ কিশোর ধর্মপদ
কেমন ক'রে বাঁচিয়েছিল
অক্ষমতার নিদারুণ গ্লানি থেকে, নিশ্চিত মৃত্যুর কবল থেকে

তার পিতাকে আর বারশত শিল্পীকে,
কেমন ক'রে পৌঁছে দিয়েছিল তাদের সার্থকতার
কাংক্ষিত তীর্থে।
কিন্তু অবশেষে তারাই দিল মৃত্যুদণ্ড,
নিঃসংশয়িত প্রতিভার চরম মূল্য—মানবের চিরন্তন ইতিহাস।
তারা ভুলতে পারেনি তাদের অক্ষমতার ক্ষোভ, দীনতার গ্লানি।
স্বার্থান্ধ তারা হীন ষড়যন্ত্র করেছে—
পুত্র হত্যায় পিতাকে করেছে প্ররোচিত।
ধর্মপদ মৃত্যু বরণ করেছে।
আলোকতীর্থ-যাত্রী হয়তো দেখেছিল,
মৃত্যুর মাঝ দিয়েই অমৃতের পথ,
হয়তো শুনেছিল,
'নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।'

তার পরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে অন্ধ, অতল কূপ-গহ্বরে।
বারশত শিল্পী পেয়েছে রক্ষা,
কিন্তু অমোঘ ন্যায়ের বিধান, দণ্ড তার নির্মম কঠোর,
দেবতা তাদের ক্ষমা করেন নি।
আত্মা তাদের অভিশপ্ত, আজো তারা মুক্তি পায়নি,
অন্যায়ের সুনিশ্চিত দারুণ, করুণ, পরিণাম।
তাইতো দেখি, দেউল পড়েছে ভেঙে,
দেবতা বিমুখ, শূন্য বেদীতল, অট্টবিদ্রূপের ভয়াল স্তব্ধতা।
তাই গভীর রাত্রে মন্দির-অংগনে শোনা যায়
ছায়ামূর্তি শত অভিশপ্ত আত্মার মর্মান্তিক আর্তনাদ।
শোনা যায় হতভাগ্য পিতার অসহায়, করুণ ক্রন্দন,

তার সংগে মিশে যায় ক্রুদ্ধ, অর্ধতৃপ্ত দেবতার গর্জমান বজ্রবাণী,
আর ঝাউগাছের শিরে শিরে জাগে তারই নিদারুণ প্রতিধ্বনি।
বেদীমূলে বসে প্রার্থনা করি, কেঁদে বলি,
"মুক্তি দাও, মুক্তি দাও,
কলুষ-নাশন, সর্বপাপঘ্ন, তাদের মুক্তি দাও।"

গোধূলির ম্লানচ্ছায়া অন্ধকারে একটি ক্ষীণ স্নিগ্ধ জ্যোতির্লেখা
স্বর্গমর্ত জুড়ে অমৃতের সেতু রচনা করে।

১৩৫৭

শূন্যবেদী

বড় দেউলের চূড়া ভেঙে পড়েছে—বিগ্রহ অন্তর্হিত, বেদীতল শূন্য কিন্তু আজও তা অটুট এবং অম্লান।

সবচেয়ে ভয়ংকর গর্ভগৃহের ঐ রিক্ত-বিগ্রহ বেদীতল,
শূন্যতার বুক-ফাটা নিঃশব্দ রোদন।
এই মহাশূন্যতা পূর্ণ করেছে আমাকে
আমার জীবনকে
আমার যুগযুগান্তর, জন্মজন্মান্তরকে,
এমনই অতলস্পর্শ এর গভীরতা।
জীবনে আর একদিন এমন মহাশূন্যতা অনুভব করেছিলুম,—
মার শেষকৃত্য সমাপন করে ফিরে আসছি,
কুয়াশায় ঢাকা শীতের রাত্রি,
রাত্রি ভয়ংকর।
কেমন যেন আচ্ছন্নতার মধ্যে কেটে গেছে এতক্ষণ,
সব যেন মিথ্যা।
জনমানবহীন পথ—নিষুপ্ত গৃহে গৃহে
জীবনের চিহ্ন পর্যন্ত নেই।
কচিৎ হয়তো কোন বিকৃত, ঘুমন্ত কাকলি ভেসে আসে,
কালো ছায়া পড়ে—
নিশাচর পাখি উড়ে চলেছে,
শোনা যায় তার পক্ষবিধুনন-শব্দ।
মরা জ্যোৎস্নায় সবটাই যেন কেমন অর্থহীন,
ছন্নছাড়া মনে হয়।

আকাশখানাও অদ্ভুত!
দূরে প্রসারিত-পুচ্ছ ধূমকেতুর আলোটা
অপার্থিব তেজে জ্বলতে থাকে।
শেষবারের মত হরিবোল দেওয়া হ'য়ে গেল,
কটি প্রাণী নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করি,
শূন্য গৃহতল,
মা নেই!
এই না-থাকাটা যে কতখানি ভয়ংকর—
সেদিন অনুভব করেছিলুম,
চোখে জল ভ'রে এসেছিল।
বেদীর শূন্যতা এমনই ভয়াল, এমনই সর্বগ্রাসী,
তবু বারে বারে আমাকে আকর্ষণ করে।
কিছু-না-থাকার এমন অপূর্ব থাকা
আমি কোথাও দেখিনি।
মন্দির পরিক্রমা ক'রে বারে বারেই
বেদীমূলে নেমে আসি।

স্তব্ধ হ'য়ে বেদীর সামনে বসে আছি,
বন্ধুরা কোথায় দূরে গিয়েছেন,
বহুক্ষণ বসে আছি—
কালরাত্রে বৃষ্টি হ'য়ে গিয়েছে,
শিলাময় কক্ষতল হয়েছে নির্মল।
বেদীর দিকে চেয়ে কেমন যেন অভিভূত হ'য়ে পড়তে থাকি।
অতি-প্রত্যক্ষতার আড়াল আস্তে আস্তে সরে যায়—
সাতশো বছর আগে সেদিন—

সেদিন মন্দিরে বিগ্রহ-প্রতিষ্ঠা,
বিগ্রহ কালো পাথরে-গড়া বিরাট সূর্যমূর্তি।
মন্দির-চত্বরে অভাবিত-পূর্ব সমারোহ,
বিচিত্রবেশ নরনারীর ভিড়ে প্রাংগণতল পূর্ণ।
তারা এসেছে বহুদিক থেকে, বহুদেশ থেকে,
কেউ বা পার হ'য়ে এসেছে বিজন ভীষণ মরুপ্রান্তর,
বিন্ধ্যাচলের যোজন-বিস্তৃত ঘনারণ্য,
কেউ বা অতিক্রম করেছে নগাধিরাজের দুর্লঙ্ঘ্য নিষেধ।
সর্বত্রই উঠছে আলোকের বন্দনাগান,
হিরণ্যদ্যুতির জয়ধ্বনি।
মন্দির বেষ্টনকারী ঝাউবনের ফাঁকে ফাঁকে
মেলা বসেছে—কলরব শোনা যাচ্ছে।

সন্নিহিত তটভূমিতে ফেনায়িত তরংগে
আছড়ে পড়ছে বিচিত্র নীল সমুদ্র।
পূজার আয়োজনে ভক্ত সেবিকা চলেছে,
চলেছে পূজারী ক্ষৌমবস্ত্রে, স্নানশুচি দেহে
ললাটে সিন্দূর-লাঞ্ছন, হস্তে সচন্দন পুষ্প-মালিকা,
দিব্য মাল্যাভরণ-ভূষিত অর্ঘ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছেন
বৃদ্ধ রাজপুরোহিত,
পরিধানে রক্তাম্বর, ললাটে চন্দনচর্চা।
পশ্চাতে চলেছেন ধীরনম্রপাদবিক্ষেপে
কাষায়বস্ত্র-পরিহিত দীর্ঘবপু মহারাজ নরসিংহদেব,
মণিদামখচিত স্বর্ণপাত্রে বহন ক'রে নিয়ে চলেছেন,
মানস-আহৃত শ্বেত পুণ্ডরীক।
বিরাট সমারোহ, বিপুল শোভাযাত্রা।

মন্দির-দ্বার উদ্‌ঘাটিত হ'ল,
অর্চিষ্মতী মংগল দীপালোকে ঝলক দিয়ে উঠল,
সহস্র-মণিরাগদীপ্ত অর্যমার বিশ্ববিমোহন
অপরূপ বিগ্রহ।
দেবধূপের সৌরভে কক্ষতল পরিপূর্ণ হ'ল—
মন্দ মন্দ আন্দোলিত হ'ল চামর,
মৃদু-আলোকে ঝলসে গেল বীজন-কারিণীদের
কনকদীপ্ত অলকাভরণ।
বিরাট ব্যজনী হস্তে রাজমন্ত্রী চললেন এগিয়ে,
রাজপুরোহিত সুস্পষ্টকণ্ঠে প্রণাম নিবেদন করলেন,
'আবিরাবীর্ম এধি।'
শত শত ভক্ত কণ্ঠে ধ্বনিত হ'ল সে প্রণাম।
জ্বলে উঠল আরতির উজ্জ্বল দীপশিখা।
সেই পূত আলোকে দেখলাম—
ভগবান সবিতার চরণে নমিত হ'চ্ছে
মাল্য-চন্দন-চর্চিত রাজ-শির,
বিনম্রসুন্দর একখানি আত্মনিবেদন।
দেবতার মুখে কি অপরিসীম করুণা,
মুগ্ধ বিস্ময়ে স্থিরদৃষ্টি মেলে চেয়ে রইলাম।

হঠাৎ চমক ভেঙে যায়, এ কি স্বপ্ন?
চারিদিক আরও নির্জন হ'য়ে উঠেছে,
মহানৈঃশব্দ্যের মাঝখানে হৃৎপিণ্ডটা শুধু
বুকের কাছে আছড়ে পড়ছে ধক্ ধক্ ক'রে।
চক্ষু মার্জনা ক'রে বেদীর দিকে চেয়ে দেখি,
কই শূন্য ত নয়।

কোণার্ক

কোন্ ফাঁকে এক ঝলক সূর্যরশ্মি
বেদীতল দিয়েছে পূর্ণ করে।
সর্বাঙ্গে রোমাঞ্চ বয়ে যায়।
মনে মনে বলি—দেবতা তুমি আছ, তুমি আছ;
এর চেয়ে বড় সত্য আর কিছু নেই।
হয়তো লুকানো আছ
উড়িষ্যার মহাপ্রান্তরের কোন অন্ধতম মৃত্তিকাগর্ভে,
অথবা কোন অবহেলিত দেবালয়ের প্রদীপ-হীন অন্ধকারে।
আমি জানি, ভক্ত সাধকেরা বেরিয়ে পড়েছে তোমার সন্ধানে,
অনাগত ভবিষ্যতের দূরপথ অতিক্রম করে আসছে তারা,
উদয়াচলের পথে জ্যোতিষ্মান্ পথিক,
ললাটে তাদের অর্ক-আশীর্বাদ,
ঝলকিত দ্যুতি যার প্রতিহত হয়ে
অজানিত অন্ধকার পথ অবারিত করছে তাদের সামনে।
দুঃখব্রত পান্থ,—আজীবন তপস্যা তাদের পণ।
তারা সমাপ্ত করবে তাদের ব্রত—
আর প্রতিষ্ঠিত করবে তোমার মহিমা।
আমি, আলোক-যাত্রী তাদের আগমনী-বন্দনা
উচ্চারণ ক'রে গেলাম।
আর রেখে গেলাম আমার ভক্তিনত হৃদয়ের নিভৃত প্রণাম।

১৩৫৭

লিয়াখিয়া

পুরী থেকে কোণার্ক-যাত্রার পথে নদীটি পার হ'তে হয়। নদী পেরিয়ে সুরু হয় দিকদিশাহীন বালুকাপ্রান্তর। নদীটির জোয়ারের কিছু ঠিক নেই। জোয়ার এলে যাত্রীকে বহুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কিন্তু ভাটার সময়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। কোন খেয়া নেই। প্রসিদ্ধি আছে যে মহাপ্রভু কোণার্ক থেকে ফেরার পথে এই নদীতীরে এসে একান্ত ক্লান্ত হ'য়ে বসে পড়েন। তখন এক বৃদ্ধা খই দিয়ে তার ক্লান্তি দূর ক'রেছিলেন। তাই এর নাম লিয়াখিয়া (খই-খাওয়া)।

লিয়াখিয়া অপরূপ নদী।
দুধারে বালুর মেলা, দিশাহীন চর,
রবিখর দু'পহরে ঝলসে নয়ন আর জ্বলে মরুশিখা,
জ্যোছনায় মায়া নামে, চোখে নামে ঘুম,
চারিদিক হ'য়ে আসে নীরব নিঝুম্।
খেয়ালি জোয়ার আসে, সোনালি জোয়ার,
লিয়াখিয়া বয়ে চলে খরতর বেগে।
লক্ষ আলোর কুচি ঢেউএ ঢেউএ ভেঙ্গে চুরে যায়।
অপরূপ—অপরূপ লিয়াখিয়া, কাহারে সে খোঁজে ?

লিয়াখিয়া স্বপনের নদী।
সেদিন দুপুরে
দুই তীরে ছলছল খেয়ালি জোয়ার এলো,
দুরন্ত জোয়ার !
দিশাহীন বালুচর—ছায়া পড়ে কার ?

কোণার্ক

পায়ে পায়ে বেজে ওঠে ধ্বনি,
কে আসে ? কে আসে ?
লিয়াখিয়া নদী দেখে সোনার স্বপন,
ছবি অভিনব,—
দেবতা দাঁড়াল আসি লিয়াখিয়া-তটে,
সোনার-বরণ দেহ, ঢলঢল লাবণির ধারা—
সহসা বসিয়া পড়ে ক্ষুধিত. কাতর,
ভেঙে-পড়া অবসাদে চলে না চরণ।
কূলে কূলে লিয়াখিয়া উছসিয়া ওঠে।
অপরূপ—অপরূপ ! কাহারে সে খোঁজে ?

সুদূরে গ্রামের পথে একা পসারিনী
খইএর পসরা মাথে চলিয়াছে নারী।
নদীতটে ভেঙে-পড়া অপরূপ শোভা তাঁর দেখে আর দেখে
তার পরে আসে ধীরে, বেদনায় আঁখি ছলছল।
সুতপা শবরী বুঝি ? দয়িত এসেছে তার !
জীবনের সাধনার ধন ?
পাদমূলে দিল রাখি খইভরা ডালা,
যেন যূথী রাশি রাশি।

দেবতা তুলিয়া লয়—
নীরবে চাহিয়া থাকে সেবিকার পানে।
করুণার বারিধারা আঁখি হ'তে ঝরে আর ঝরে।
লিয়াখিয়া বয়ে চলে খরতর বেগে।
সোনার আলোক ঝলে ভরা বুকে তার,
খেয়ালি জোয়ার তার, সোনালি জোয়ার।

লিয়াখিয়া

অতীতের যবনিকা সরে গেলে পরে
সেদিন স্বপনে, দেখিলাম লিয়াখিয়া।
লিয়াখিয়া অপরূপ নদী।
যাহারে সে খুঁজেছিল পেয়েছে কি তারে ?

১৩৫৭

ময়ূরাক্ষী

ফিরছি দুমকা থেকে—
সমস্তদিন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ময়ূরাক্ষীর ধারে ঘুরেছি,
গাড়িওয়ালাও ঘুরেছে, আমাকেও ঘুরিয়েছে।
অনন্যা এই ময়ুরাক্ষী নদী,
একদিকে রৌদ্রালোকে বালু চিক্ চিক্ করে
আর অন্য দিকে সুভগা স্বচ্ছ তোয়ধারা।
নদী বয়ে চলেছে কালো পাহাড়ের কোলে কোলে
মহুয়া বনের ধার দিয়ে,
শাল-পিয়ালের তল ছুঁয়ে, ছায়া বুকে নিয়ে,
সাঁওতালী কিশোরের বাঁশির সুরে চঞ্চলা তন্বীর মত।
আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছি তার বুকে,
অনেকক্ষণ স্থির হ'য়ে শুয়েছিলুম।
আমার দেহখানাকে ঘিরে—আমগ্ন ক'রে
তোয়ধারা কলমুখর হয়েছে ছলাৎ ছলাৎ ছল।
প্রিয়া-সংগসুখ অনুভব করেছি ;
রক্তে লেগেছে দোলা, আবেগে জড়িয়ে ধরেছি জলসুন্দরীকে।
বর্বর আমি, ফিরে গেছি আদিম যুগে,
প্রাক্-প্রস্তর যুগে, ফিরে গেছি ইতিহাসের সীমানা পেরিয়ে,
যেদিন মানুষের কাম্য ছিল নারী আর ধরণী।
দুচোখ ভরে মোহ নেমেছে—
কেটে গেছে কতক্ষণ—কেটে গেছে অনেকক্ষণ।

হঠাৎ চোখ মেলে চেয়েছি,
চোখে পড়েছে নির্বারিত নীল আকাশ,
পাহাড়ের ফ্রেমে বাঁধানো প্রকাণ্ড একখানা নীলা।
একখণ্ড মেঘ ভেসে চলেছে
রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝকে শরতের একটুকরো মেঘ ;
বাতাস বইছে, নন্দনবনবাতাস, অজানা ফুলের গন্ধ মেখে।
আর সামনে-দূরে বিটপীঘন পাহাড়ের নিরুদ্দেশ যাত্রা।
পিছলে-পড়া আলোয় বনানী দুলছে,
কালো মেঘের বুকে শ্যামল-দ্যুতি বিদ্যুৎচ্ছটা,
যতদূর দৃষ্টি চলে অতর্কিত ভংগীতে চলেছে এই পাষাণের ঢেউ,
'অবনীর অন্তরাগ্নি বুঝি একদিনেই এ তরংগ তুলেছিল।'
মাটির একান্ত কাছে নেমে গেছি—
সভ্যতার চূড়া থেকে আদি মানবের মাঝে,
প্রকৃতি-সম্ভোগের তীক্ষ্ণাগ্র মুহূর্তের চূড়ায় মনঃপ্রাণ
দোল খেয়েছে।

অনুভব করেছি, মাটির কূল ছাপিয়ে
বয়ে চলেছে যে-শ্যাম জাহ্নবীর ধারা তার সহস্র আলাপন।
দেখেছি নীবারধান্যের গুচ্ছ হাতে
তনুমধ্যা কৃষ্ণাকে, সাঁওতালী বধূকে,
চোখে তার কৃষ্ণসারের আয়ত স্নিগ্ধতা।
দেখেছি কৌতুক-রসে-ভেঙে-পড়া উচ্ছলা তরুণীকে,
কালো যমুনায় ঢেউ দিয়েছে,
উদ্ধত-যৌবনা পার হ'য়ে চলেছে ময়ূরাক্ষী
নিজেকে ধন্য মনে হয়েছে, মনে হয়েছে কৃতার্থ।

সমস্ত দিন পরে ফিরে চলেছি দেওঘরে—
আমার কুটিরে, বাঞ্ছিত-তীর্থে
যেখানে বিরাজিতা আমার ধূমায়মান জীবনের
স্থিরদ্যুতি মংগল-দীপিকা,
আর যেখানে উটজ প্রাংগণে অতিথি-শিশুর কলরব,
জীবনের লীলাচঞ্চল প্রবাহ।

সামনে জ্যোৎস্নারাত্রি মেলে ধরেছে কল্পলোকের মায়া,
শুক্লপক্ষের শেষ চাঁদ—মায়াবী চাঁদ আকাশে।
দূরান্তের বনানী-শিয়রে রাত্রির স্বপ্ন জড়ানো।
জ্যোৎস্না-ধবল বিশাল-প্রান্তর ভেদ ক'রে চলেছে
পীচঢালা কালো পথ, মসৃণ চিক্কণ নাগিনীর
মতই ভয়াল সুন্দর,
কোথাও গাছের ছায়ায় কালোতর—কোথাও পাহাড়ের
মায়ায় রহস্য-ঘন,
একান্ত নির্জন পথ, অবাধ, নিরুদ্দেশ।
মাঝে মাঝে ঝড়ের মত প্রচণ্ডবেগে বেরিয়ে যায়
এক একটা গাড়ি,
পথটা জীবন্ত মনে হয়—
কোথাও স্থির হয়ে নেই, কখনও ফুলে উঠেছে তীব্র আবেগে,
কখনও বা শ্রান্ত অবসাদে নতমুখী।

দীপ্ত-চক্ষু একটা দানব ছুটে আসছে
বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে গেল,
চোখে ঝলসে গেল বসে-থাকার কয়েকটি বিচিত্র ভংগী,
কয়েকখানা মুখ, অদ্ভুত, অপরিচিত, অসংলগ্ন,
শোনা গেল কয়েকটা ছিন্ন কথার টুকরো।

গাড়ির চলার বিরাম নেই—পথেরও কি শেষ নেই !
কবে যাত্রা করেছি ! তখনো ভোরের পাখি জাগেনি,
নক্ষত্র-মণি-খচিত চাদরখানা জড়িয়ে নিয়ে
আকাশ তখনো ঘুমিয়ে ।
চাঁদের মুখে বিদায়-পাণ্ডুর হাসি,
টর্চটা একবার তুলে ধরি, একখানা মুখ, কী অপূর্ব স্নিগ্ধতা !
বিদায়ের ক্ষণে বেপথুমানা, কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে ।
আমি ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসি ।
তারপরে সূর্য উঠেছে—অন্তহীন গগন পরিক্রমা করেছে,
গলিত স্বর্ণপ্রভ ময়ূরাক্ষীর জল ভেঙেছে আর ভেঙেছে,
কতক্ষণ যে কেটে গিয়েছে !

রাত্রি চলেছে এগিয়ে—
তারা অপেক্ষা করছে—চেয়ে আছে পথের দিকে,
সামান্য একটু শব্দে চমকে ওঠে, এলো নাকি ?
উঠানে ঘনসবুজ করবী-পল্লবে আলোর ঝিলিমিলি,
কূয়োতলাটা একেবারে নির্জন—কেমন যেন !
দড়িটা পড়ে আছে কুণ্ডুলী পাকিয়ে—নির্জীব সাপের মত ;
শিশুরা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে—
একা চাঁদ মাথার উপরে,
এখন রাত্রি কত ?
পাশের বাড়ির ওরা শয্যা নিল ।
করবী ঝাড়ে পাখা-নাড়ার শব্দ—
রাত্রির পাখিটা আজও এসেছে বুঝি ?
টিহি—টিহি—টি—

শব্দটা নিস্তব্ধতার প্রান্তে সুরের পাড় বুনে চলেছে
দিগন্ত পেরিয়ে—অনেক দূর পর্যন্ত।

গাড়ি ঝাঁকানি দেয়—দূরে কালোয়-কালো প্রকাণ্ড
একটা ছায়া,
ত্রিকূট পাহাড়—কী অদ্ভুত !
দিনের বেলায় মনে হ'য়েছে অপূর্ব,
ধেয়ে-আসা উত্তরংগ সমুদ্র হঠাৎ পাষাণ-স্থির হয়ে গিয়েছে,
রাত্রে কিন্তু অপার্থিব বলে মনে হ'চ্ছে।
ত্রিকূট ছাড়িয়ে গ্রামের পথ—
বিক্ষিপ্ত কুটিরগুলি বোবা প্রাণীর মতো নীরব,
একটা চাপা স্তব্ধতা।
পাহাড়তলীর গ্রাম—আশে পাশে ছোট ছোট শৈলশিশুর দল,
যেন কালো কালো নিশীথবিহংগম।
বহুদূর পর্যন্ত শব্দের রেখা টানতে টানতে
চলেছে একটা গোরুর গাড়ি।

এবার নামতে হবে,
নেমে প্রায় ছুটেই চলি—
পথটা একেবারে নির্জন, যেন নির্মানব দেশ।
বাঁকটা ঘুরেই শিবগংগার ধারে লছমীপুরার রাজবাড়ি
সাদা পাথরের গোপুরমের মত।
দারোয়ান দ্বারের কাছে বসে ঢুলছে,
তাইত রাত্রি কত ?

পার হ'য়ে বিলাসীর পুল—
নিচে দিয়ে বয়ে চলেছে ক্ষীণ কান্নাস্রোতের মত
ঝিরঝিরে একটা নদী।
পুলের মুখে দুটো গাছ—রাত্রির জাগ্রত প্রহরী।
মাথায় মাথায় জোনাকি জ্বলছে—কালো নিকষে সোনার ছিটে।
আর একটু এগিয়ে শেঠেদের বড় বাড়িটা গাছপালায় ঝাপসা,
তারপর—তারপর বাঁক নিয়ে বড় পাঁচিল-ঘেরা বাগান,
বন্ধ পাঁচিল বিসর্পিল গতিতে চলে গিয়েছে,
এত উঁচু যে বাহিরে থেকে কিছুই দেখা যায় না।
বুকখানা ধড়াস ধড়াস করে—
মল্লিকদের শ্বেতপাথরের ঠাকুর-দালানটা চকিতে গেল মিলিয়ে,
পথটা ছুটেই এসেছি।
বন্ধ পাঁচিলের পাশে গেটের কাছে দাঁড়াই ;
তারপরে দ্বিগুণ জোরে গেটটা ঠেলে ধরি,—
এক ঝলক আলো—একটা কলকণ্ঠ উল্লাস,
বাতায়ন পথে চোখে পড়ল একখানি আনম্র-সুন্দর মূর্তি,
কানে হীরার দুলটি ঝক্‌ঝক্ করছে,
যেন ময়ূরাক্ষীর প্রতিহত-রশ্মি অতল স্বচ্ছতা,
উতলা ময়ূরাক্ষী।
মুহূর্তে সবার মাঝে এসে দাঁড়ালেম।

মাথার উপরে তারায় তারায় ভরা আকাশ,
চাঁদ সুধার ভারে ভেঙে পড়বে বুঝি,

বিলাসী—দেওঘরের একটি অঞ্চলের নাম

রমণীয় মধুর সুরভি-বাতাস বইছে,
বুকভরে নিশ্বাস নিই।
এই তো জীবন—এইতো স্বর্গ।
বাহিরে পাখিটা রাত্রির কুহক উচ্চারণ করতে থাকে,
টিহি—টিহি—টি—
সুরটা ভেসে যায় অনেক—অনেক দূর পর্যন্ত।

১৩৫৭

তেইশে জানুয়ারি

মংগল শংখ দিকে দিকে বিঘোষিত করলে শুভ-লগ্নকে,
অভ্যর্থনা জানালে তোমার জন্মক্ষণকে,
আমরা যেন প্রত্যক্ষ করতে পারি তোমার জ্যোতির্ময় আবির্ভাব,
যেন উচ্চারণ করি, জয় হোক চির-জীবিতের
জয় হোক মহাবিপ্লবের।
চিরজীবিত তুমি, তাই তো তোমার জন্মক্ষণ
বিস্মৃতির অতলে গেল না তলিয়ে,
প্রলয়-পয়োধি-জলে ফুটে উঠল অভিনব সৃষ্টি-শতদল।
শোভা পেল মহাকাল-করধৃত অঙ্গুরীয়কের মত,
অস্খলিত দ্যুতি যার পার হ'য়ে চলে মৃত্যুর মহার্ণব,
আর ঝলকিত ক'রে তোলে আমাদের হারানো যাত্রাপথ।

রণ-দুর্জয় হে বীর, তুমি বহন ক'রে এনেছিলে চির-বিপ্লবের বাণী,
বদ্ধতার মহতী বিনষ্টি থেকে জাতিকে বাঁচাতে হবে,
আহরণ ক'রে এনেছিলে অমৃত—
পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে হবে
জন্মভূমি মাতাকে।
তোমার সাধনা ছিল মৃত্যুপণ,
প্রলয়লগ্নে যে দেবতা ধ্বনিত ক'রে তোলে সৃষ্টির সংগীত
সেই ভীমকান্ত ভৈরবের পরম দ্যুতি এসে পড়লো তোমার হৃদয়ে।
তোমার বিপুল প্রয়াস জাতির সম্মুখে
প্রতিষ্ঠিত করলে জীবনের শৌর্যভূয়িষ্ঠ আদর্শকে।

কোণার্ক

ভারতের সুদূর প্রান্তে নিঃসঙ্গ দাঁড়িয়ে
প্রকাশিত করলে মহাভারতের অপরূপ স্বপ্ন,
স্বাধীনতা সংগ্রামের নবতর অধ্যায়,
রণ-দুর্বার জাতীয় সেনাদল।

তুমি মুক্ত ক'রে দিলে বিপ্লবের প্রচণ্ড ভয়ংকর প্রবাহ—
ভেঙে পড়লো তার আঘাতে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যসৌধ,
একদা অচল মনে হ'য়েছিল যার সুদৃঢ়-প্রতিষ্ঠা ভিত্তি।
সেই ভিত্তি আজ শতধা বিদীর্ণ,
সে অচলায়তন আজ ধূল্যবলুণ্ঠিত।
ভগ্নস্তূপ সেই ভয়াল শ্মশানে এসে দাঁড়িয়েছি—
বোধ করি তিমিরান্ধ রাত্রির শেষ যাম,
ভয়াবহ কাল-রাত্রি।
শোনা যায় নর-শোণিত-পিপাসু কাপালিকের উল্লাসধ্বনি,
আর শোনা যায় উচ্চকিত তোমার অভয়বাণী,
'অন্ধকার যদি সত্য হয়,
কেন সত্য হবে না তমসঃ পরস্তাৎ আদিত্যবর্ণ উদার আলোক।'
অতএব পার হয়ে চল—চল এগিয়ে।'

তাই আজ তোমার জনমের পরম মুহূর্তে
তোমাকে প্রণাম করি, অভিনন্দন করি
তোমার দুঃসাধ্য প্রয়াসকে,
আর প্রার্থনা জানাই,
'প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে।'
দূর হোক আমাদের অবসাদ—দ্বিধা দ্বন্দ্ব।
জাগ্রত হোক ভগবান।

১৩৫৭